ইমাম গাযালী (র)
সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

গীবত

ইমাম গাযালী (র)

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

প্রোপ্রাইটর

আহসান পাবলিকেশন

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৫১০৬৫৫০

ISBN-984-31-0933-3

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০০০

সপ্তম প্রকাশ

জুন ২০১৪

কম্পিউটার কম্পোজ

যমুনা কম্পিউটার

৬৭ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা

মুদ্রণ :

মীম প্রিন্টার্স

নীলক্ষেত, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : সত্তর টাকা মাত্র

GIBAT (Backbiting) by Imam Gazali (R), Syed Abdul Hai Laknabi (R) and Syed Abul A'la Maududi (R), Translated by Muhammad Musa, Published by Muhammad Gholam Kibria, Ahsan Publication, 38/3 Bangla Bazar, Dhaka-1100, 7th Edition June 2014 Price : 70.00 only.

AP-03

ভূমিকা

আমরা অপ্রয়োজনে অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে অপরের দোষচর্চা করে একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হই। অপরের দোষচর্চা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যের দোষচর্চা না করলে যেন পেটের ভাত হজম হতে চায় না। মনে হয় যেন কি একটা প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়নি। যেখানেই অন্তত দুইজনের জটলা দেখা যায় সেখানেই অন্য কিছু না করলেও অপরের দোষচর্চা অবশ্যই করা হয়। এ যেন হেরোয়িন সেবীদের মত আমাদের সকলের পরিত্যাগ অযোগ্য এক অভ্যাস। হেরোইন সেবন একটি ব্যক্তিকে ধ্বংস করে কিন্তু অপরের দোষচর্চা একটি সমাজকেই ধ্বংস করে ফেলে। তাই এই অভ্যাস অত্যন্ত বিপদজনক অতীব মারাত্মক। এই অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং তদস্থলে নিজের দোষের চর্চা করতে হবে, তাহলে সংশোধনের পথ পাওয়া যাবে, জীবনকে উন্নত করা যাবে। এই আশা নিয়েই পাঠকদের হাতে পুস্তকখানি তুলে দিলাম।

বিভিন্ন যুগের তিনজন মহান মনীষীর গীবত সম্পর্কিত নিবন্ধের অনুবাদ অত্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ইসলামের মহান মুজাদ্দিদ অমর ব্যক্তিত্ব ইমাম গাযালী (র) তাঁর "ইহ্য়া উলূমিদ দীন" গ্রন্থে গীবত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লামা সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)-এর "গীবত" শীর্ষক গ্রন্থখানি আমি সর্বপ্রথম অনুবাদ করি। পরে ইমাম গাযালী (র)-এর গীবত সম্পর্কিত নিবন্ধ অনুবাদ করতে গিয়ে লক্ষ্য করি যে, এর অধিকাংশ তথ্য পূর্বোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাই গাযালীর নিবন্ধের যে অংশ লাখনাবী (র)-এর গ্রন্থে আসেনি, আমি কেবল সেই অংশ গাযালী (র)-এর নিবন্ধে আলোচনা করেছি। যুগশ্রেষ্ঠ আলেম মহান মুজাদ্দিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (র)-ও গীবত সম্পর্কে একটি অত্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হলো।

কোন গ্রন্থে তথ্যের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু উপরোক্ত তিনজন মহান মনীষীর লেখা একই বিষয়কে কেন্দ্র করে হওয়াতে তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। অবশ্য এর একটা উপকারও আছে পাঠকের জন্য। পাঠক অনায়াসে বিষয়টি বারবার পড়ে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হন। বিষয়বস্তু তার জন্য সহজবোধ্য হয়ে যায়।

আবু হামেদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (র) ৪০৪ হিজরী সালে (১০৫৯ খৃ.) বর্তমান ইরানের খোরাসান প্রদেশের তাহিরান-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর শতকের

মহান মুজাদ্দিদ। কীমিয়া-ই সাআদাত ও ইহ্য়া উলূমিদ দীন তাঁর অমর গ্রন্থ। তিনি ৫০৫ হিজরীর ১৪ জুমাদা আস-সানী তারিখে (১১১১ খৃ.) ইনতিকাল করেন।

আল্লামা সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র) ১২০৮ হিজরীর ১২ রমযান (১৭৯৩ খৃ.) ভারতের রায়ব্রেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বর্তমান শতকের বিশ্ববরেণ্য আলেম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (র)-এর পিতা। তাঁর অমর গ্রন্থ নুযহাতুল খাওয়াতির (৮ খণ্ডে সমাপ্ত) উপমহাদেশের বরেণ্য আলেমগণের জীবনী গ্রন্থ। তিনি ১৩৪১ হিজরীর ১৫ জুমাদা আস-সানী (১৯২৩ খৃ.) তারিখে ইনতিকাল করেন। তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা)-র বংশধর।

আল্লামাসাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ১৩২১ হিজরীর ৩ রজব (১৯০৩ খৃ.-এর ২৫ সেপ্টেম্বর) অবিভক্ত ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যের আওরঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বশিক্ষিত মহান আলেমে দীন। তিনি তাঁর লেখনি, বক্তৃতা ও রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষিত বিপুল সংখ্যক লোককে ইসলামের ছায়াতলে টেনে এনে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদে পরিণত করেন। বিশ শতকের কোন আলেমই ইংরেজী শিক্ষিতদের উপর এতো ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হননি। এই মহান মনীষী ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর (১৪০০ হিজরী) আমেরিকার বাফেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তিনি হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-র বংশধর।

মুহাম্মদ মূসা
গ্রাম ঃ শৌলা, পো ঃ কালাইয়া
থানা ঃ বাউফল
জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

চতুর্থ ভাগ

প্রথম ভাগ

গীবত কি?

-মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবী (র)

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষক্রটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে শরীআতের পরিভাষায় গীবত বলে, তা বাচনিক অথবা লেখনীর মাধ্যমে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায়ই বর্ণনা করা হোক না কেন, সে ব্যক্তি মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম। যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে তা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে, কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় বুহতান। এই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করা হলো ঃ

কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ক্রটি বর্ণনা করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ক্রটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ কিন্তু তুমি তার ক্রটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল (ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)। তাবিঈ ইবরাহীম (র) বলেন ঃ

اِذَا قُلْتَ فِي الرَّجُلِ مَا فِيْهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

"কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"

(ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আছার)।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, গীবত কাকে বলে তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, আমাদের জানা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সমালোচনা করা হলো গীবত, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সেই দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও কি তা গীবত হবে? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো তবেই তো তার গীবত করলে। আর তুমি যা বললে তা যদি বাস্তবিকই তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করলে (ইমাম বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আখাকা' (তোমার ভাই) শব্দের ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তুমি যার গীবত করছো সে তোমার নিকটাত্মীয় না হলেও মূলত তোমার ভাই। (এক) তার ও তোমার আদি পিতা একই ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন হযরত আদম (আ)। (দুই) তার ও তোমার আদি মাতা একই নারী, তিনি হচ্ছেন হযরত হাওয়া (আ)। (তিন) তুমি ও সে উভয়েই মুসলমান, আর সকল মুসলমান পরস্পরের ভাই। অতএব নিজের সহোদর ভাইয়ের গীবত করা থেকে মানুষ যেরূপ বিরত থাকে, অন্যদের গীবত করা থেকেও তদ্রূপ বিরত থাকা উচিত।

একদা মহানবী (স) বলেন ঃ اَلْغِيْبَةُ اَنْ تَذْكُرَ الْمَرْأَ بِمَا فِيْهِ

"গীবত এই যে, তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষত্রুটি বর্ণনা করছো যা প্রকৃতই তার মধ্যে রয়েছে।"

সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো মনে করতাম যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তার সাথে সেই দোষ সংশ্লিষ্ট করে বর্ণনা করাই হচ্ছে গীবত। তিনি বলেন ঃ এটা তো মিথ্যা অপবাদ (আব্দ ইবনে হুমাইদের সূত্রে সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থের বরাতে)।

বর্তমান কালে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলে পরচর্চায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে এবং শয়তানের আনুগত্য করে চলছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত গীবতের

সংজ্ঞা দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। মুসলমানগণ! আন্তরিকভাবে একটু চিন্তা করে দেখুন, কিভাবে আপনারা আবর্জনার পংকে নিমজ্জিত হচ্ছেন।

কোন কোন লোক বলে যে, কারো এমন কোন দুর্নাম বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয় যা তার সামনে বলা সম্ভব নয়। অতএব সামনে বর্ণনা করা যায় এমন কোন দুর্নাম গাইলে তা গীবত হবে না। এই সংজ্ঞা মোটেই ঠিক নয়।

এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির গীবত বর্ণনা করছিল। আমি (গ্রন্থকার) বাধা দিয়ে বললাম, কেন অন্যের দোষচর্চা করছো? সে বললো, আমি যা বলছি তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনেও বলতে পারি, এতে আমার কোন পরোয়া নাই, অতএব এটা গীবত হবে না।

উপরে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিস্কার জানা যায় যে, কারো সামনে বলার মত দোষ হোক অথবা সামনে বলার মত দোষ না হোক–উভয় প্রকার দোষের চর্চা করাই গীবত।

কতক লোক বলে যে, কারো মধ্যে যে দোষ নাই তা তার প্রতি আরোপ করাকে গীবত বলে। কিন্তু কারো সত্যিকার দোষ বর্ণনা করলে তা গীবত হবে না।

উত্তর ঃ এইমাত্র হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে দোষ কোন ব্যক্তির মধ্যে নাই তা তার প্রতি আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য। অতএব উপরোক্ত কথা যারা বলে তারা প্রকারান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।

আবার কতক লোক বলে, যে দোষটি অন্যের জানা নেই সেই ধরনের দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবে না যা সকলে জানে। এদের যদি বলা হয়, তুমি কেন গীবত করছো তখন জবাব দেয়, এটা তো গীবত নয়, কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয়, সকলেই জানে। এমন তো নয় যে, আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পারে।

উত্তর ঃ এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ দোষ প্রসিদ্ধ হোক বা গোপন—তা বর্ণনা করার সাথে সাথে গীবত হয়ে যায়। দোষ প্রসিদ্ধ না হলে বরং তার চর্চায় দ্বিবিধ পাপ হয়,একটি গীবতের পাপ এবং অপরটি দোষ প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানোর পাপ। আর যে দোষ সকলের জানা আছে তার ক্ষেত্রে কেবল গীবত করার পাপ হয়।

গীবতের প্রকারভেদ

মুসলমানের গীবত

গীবত প্রথমত তিন প্রকার। (এক) মুসলমানের গীবত করা। এটা অকাট্যভাবেই হারাম। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ .

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)।

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম (كُمْ) সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

অমুসলিম নাগরিকের গীবত

(দুই) ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম (বিস্তারিত আলোচনা রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

(তিন) ফিক্হ-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় পর্যায় গীবত দুই ভাগে বিভক্ত। জীবিত ব্যক্তির গীবত করা এবং মৃত ব্যক্তির গীবত করা। জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ মৃতদের গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই

হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও। এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন ঃ

اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلاَ تَقَعُوْا فِيْهِ .

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না" (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ)।

لاَ تَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا .

"তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"

হাদীসটি ইবনে হিব্বান (র) রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবদুল আজীম আল-মুনযিরী তাঁর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব-এ সংকলন করেছেন।

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ .

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক" (আবু দাউদ)।

হাদীসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি-বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর চারটি কারণ রয়েছে। (এক) মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদেরও মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হযরত আবু দারদা (রা) প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না। কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত।

(ইহ্‌য়া উলুমিদ-দীন, কিতাবুল আমওয়াত)।

(দুই) মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের

জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলূমিদ-দীন)।

(তিন) মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন ঃ হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ تَذْكُرُوْا مَوْتَاكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّهُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ تَاْثَمُوْا وَاِنْ يَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْهِ .

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট"(ইহ্য়া উলূমিদ-দীন)।

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াযীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ। অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (র) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন। 'মাতালিবুল মুমিনীন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তবে নীরবতা অবলম্বনই উত্তম।

দৈহিক কাঠামোর গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ক্রটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থূলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ক্রটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

حَرَمَ اللّٰهُ اَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ .

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছূর)।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাঊদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ .

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (সূরা হুজুরাত ঃ ১১)।

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে (সুয়ূতীর দুররুল মানছূর, আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি। তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে গীবত অধ্যায়ে ফকীহ্ আবুল লাইছ উক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোন মজলিসে নাচগান হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। তাতারখানিয়া গ্রন্থে এই মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পানাহার শীর্ষক অধ্যায়ে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

পোশাকের গীবত

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ لِاَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰى اَحَدٍ اِلاَّ بِالدِّيْنِ اَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ .

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবু বাক্‌র ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন ঃ তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছূরে)।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ (গীবতের শাস্তি সম্পর্কিত আলোচনায় হাদীসটি সবিস্তারে আলোচিত হবে)।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ

করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

এক সফরে আবু বাক্‌র ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান ঃ তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সকারে আহার করোনি? তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ আমাদের ভাগ্যে গোশত জুটেনি। তিনি বলেন ঃ তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ, আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, লোকটি দুর্বল, আমাদের খেদমত করতে পারে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটাও বলো না, কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না (তিরমিযীর নাওয়াদিরুল উসূল এবং সুয়ূতীর আদ-দুররুল মানছূর)।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .

"তোমরা পরস্পরের গীবত করো না।"

অত্র আয়াতে গীবত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে (ইবনে জুরাইহ-এর সূত্রে দুররুল মানছূরে)।

ইবাদতের গীবত

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি

তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহ্‌র জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইহ্‌য়া উলূমিদ-দীন)।

গুনাহের গীবত

যেমন বলা ঃ অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (র) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই

রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে।

মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ক্রটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ক্রটি চর্চাকারীও তো ক্রটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে। হযরত উমার ফারূক (রা) বলেন ঃ

كَفٰى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاَثٌ يُعِيْبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِيْ بِهٖ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوْبِ النَّاسِ بِمَا لاَ يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهٖ وَيُؤْذِيْ جَلِيْسَهٗ فِيْ مَا لاَ يَعْنِيْهِ .

"মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট। (১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে। (২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ। (৩) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে" (আবুল লাইস আস-সামারকান্দী বাবুল গীবত-এ উদ্ধৃত করেছেন)।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন ঃ "আল্লাহ্‌র স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষক্রটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ

থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহ্‌গারকে অপমান করো না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তাআলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাহ্)।

হযরত আদম (আ) জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ভুল করলে তাঁর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন, তুমি বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করো, অতঃপর তা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করো, তাহলে তোমার গুনাহ মাফ করে দিব এবং তোমার তওবা কবুল করবো। আদম (আ) কাবার নির্মাণ কাজ শেষ করলে জিবরীল (আ) বেহেশত থেকে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) নিয়ে আসেন। তখন এর রং ছিল অত্যন্ত সাদা এবং তা থেকে আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তো। পাথরটি দেখে আদম (আ)-এর বেহেশতের সুখশান্তির কথা স্মরণ হলো, মনটা অস্থির হয়ে পড়লো এবং চোখে অশ্রু নদী প্রবাহিত হলো। সাদা পাথর বললো, হে আদম! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে। পাথরের কথায় তাঁর মনে কষ্ট হলো এবং তিনি অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমার অপরাধের জন্য প্রতিটি জিনিস,এমনকি বেহেশতী পাথর পর্যন্ত আমার নিন্দা করছে। এ কথায় আদম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হলেন এবং তাঁর দেহের কৃষ্ণবর্ণ উক্ত পাথরের মধ্যে অপসারণ করলেন, ফলে তা কালো হয়ে গেল এবং পাথরের শুভ্রবর্ণ আদম (আ)-কে দান করলেন, ফলে তাঁর দেহ আলোক-উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো (সাফূরীর নুযহাতুল মাজালিস মুনতাখাবুন নাফাইস, বাব আয়্যামিল-বীদ)।

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে গীবত

সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি ঃ যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষক্রটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে ঃ যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষক্রটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَا أُحِبُّ اَنِّیْ حَکَیْتُ اَحَدًا وَاَنَّ لِیْ کَذَا وَکَذَا .

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ مَا يَسُرُّنِیْ اَنِّیْ حَکَیْتُ وَلِیْ کَذَا وَکَذَا

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়" (ইহয়া উলূমিদ দীন, বাবুল গীবাত)।

ইশারা-ইংগিতে গীবত

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো ঃ আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

মুখের গীবত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন ঃ তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ আমরা তো গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল (তাফসীরে দুররুল মানছূর)।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে চলে যাওয়ার পর অপর ব্যক্তি তার গীবত করে এবং তার দোষক্রটি বর্ণনা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে লোক! তুমি দাঁত খিলাল করো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমি গোশত খাইনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এইমাত্র এক মুসলিম ব্যক্তির গোশত খেলে (তাবারানী; মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)।

কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِذَا وَقَعَ فِى الرَّجُلِ وَاَنْتَ فِىْ مَلَاٍ فَكُنْ لِّلرَّجُلِ نَاصِرًا وَّلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ .

“কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো” (ইবনে আবিদ দুন্য়া থেকে দুররুল মানছূর-এ)।

অন্তরের গীবত

কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং কোন খোদাভীরু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য-প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া। এই বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃত গীবত। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে (বায়হাকীর বরাতে তাফসীরে দুররুল মানছূরে)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّشِيْرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيْهِ .

"কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়" (ইমাম গাযালীর হুকূকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ .

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (সূরা হুমাযা ঃ ১)।

'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে জুরাইজ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'। ইমাম সুয়ূতী (র) দুররে মানছূর-এ উপরোক্ত রিওয়ায়াত নকল করেছেন। ইমাম বাগাবী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'। সুলায়মান জামাল তাফসীরে জালালাইন-এর টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ هٰؤُلاَءِ الْهَمَّازُوْنَ وَاللَّمَّازُوْنَ

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"।

উপরোক্ত হাদীস আল্লামা মুনযিরী (র) তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে নকল করেছেন।

লেখনীর মাধ্যমে গীবত

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

গীবতের বৈধ পন্থা

যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পুণ্যের কাজ এবং যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআত গীবত করার অনুমতি দিয়েছে এখানে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

আল্লামা ইমাম নববী (র) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে, ইমাম গাযালী (র) ইহ্‌য়া উলূমিদ-দীন ও কীমিয়া সাআদাত গ্রন্থদ্বয়ে, সাফূরী (র) নুযহাতুল মাজালিস গ্রন্থে, ফাকিহী (র) মাতালিবুল মুমিনীন গ্রন্থে এবং বালখী আইনুল ইলম গ্রন্থে গীবতের ছয়টি পন্থা বৈধ বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (র) রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে আরও চারটি পন্থা বৈধ বলে অনুমোদিত গীবতের সংখ্যা দশে উন্নীত করেছেন। আমি তার সাথে আরও তিনটি পন্থা যোগ করে বৈধ গীবতের সংখ্যা তের-এ উন্নীত করেছি এবং প্রতিটি পন্থা বৈধ হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছি।

(এক) কোন ব্যক্তি বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা পদস্থ কোন কর্মকর্তার জুলুমের শিকার হলে সে রাজ-দরবারে তার প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারবে। কারণ রাজ-দরবারে জালেমের গীবত না করলে সে প্রতিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু নালিশের কারণে শাসনকর্তা জালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করে তদস্থলে ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন এবং ফলে নিরীহ লোকেরা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে। অতএব এই উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।

শোবা (র) বলেন, জালেমের বিরুদ্ধে নালিশ করা অথবা কোন পাপাচারী সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করার উদ্দেশে তার গীবত করা বৈধ, বরং জালেম ও পাপাচারীর সংসর্গ থেকে লোকদের দূরে রাখার জন্য তাদের দোষক্রুটি বর্ণনা করা গীবত নয় (বায়হাকীর বরাতে আদ-দুররুল মানছূর)। উপরোক্ত বিষয়ে ইমাম গাযালী, সাফূরী, বালখী ও ফাকিহী ঐক্যমত পোষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ مَنْ ظُلِمَ .

"মানুষ খারাপ ব্যাপারটি বলুক তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র" (সূরা নিসা ঃ ১৪৮)।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী 'লা ইউহিব্বু'-এর তাৎপর্য এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন পাপের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ্ তাআলা তা প্রকাশকারীকে শাস্তি দিবেন। 'আল-জাহ্‌রা বিস-সূ' অর্থ বদদোয়াও হতে পারে। যেমন ইমাম রাযী (র) তাফসীরে কবীরে ইবনে আব্বাস (রা)-র বরাতে লিখেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর ব্যক্তির বদদোয়া আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, তবে যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েছে সে জালেমকে বদদোয়া করলে তা বৈধ হবে। অথবা শব্দটির অর্থ দোষ বর্ণনা করাও হতে পারে। যেমন আল্লামা বাগাবী (র) মুজাহিদ (র)-এর বরাতে নকল করেছেন। অথবা উভয় অর্থই হতে পারে, যেমন তাফসীরে জালালায়নে গ্রহণ করা হয়েছে। তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে ঃ কোন ব্যক্তি জনসমক্ষে অপর ব্যক্তির দোষক্রটি প্রকাশ করলে অথবা তাকে বদদোয়া করলে আল্লাহ তাআলা দোষ চর্চাকারী ও বদদোয়াকারীকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুমের শিকার হয়েছে সে জালেমকে বদদোয়া করলে বা তার গীবত করলে সেটা বৈধ হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি কতক লোকের মেহমান হতে চাইলে তারা তাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানায়নি। সে প্রকাশ্যে তাদের বদনাম করলো। তার এই আচরণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ক্ষেপে গেলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে গীবত করার অনুমতি দান করেন। এই ঘটনা মুসনাদে আবদুর রাযযাকে মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে এবং কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপতিও তাফসীরে মাযহারীতে তা নকল করেছেন।

হাদরামাওতের এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই মর্মে অভিযোগ করলো যে, শেষোক্ত ব্যক্তির পিতা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এক খণ্ড জমি জবরদখল করে নিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীআতের বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন (আবু দাঊদ)।

(দুই) কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সেই সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে, উপদেশ দিতে পারবে বা তার উপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিরই উপকার হয়। গীবতের এই পন্থা মাতালিবুল মুমিনীন, আইনুল ইলম, সীরাতে আহমাদিয়া, রদ্দুল মুহতার, তানবীরুল আবসার, ইহ্‌য়া উলূমিদ-দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম ও মুনতাখাবুল আনফাস প্রভৃতি গ্রন্থে বৈধ বলা হয়েছে।

কুফার গভর্নর হযরত সাদ (রা)-র বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলীফা হযরত উমার (রা)-র নিকট নালিশ করলো। একটি অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়েন না এবং নামাযের কিরাআত ঠিকমত পড়েন না। খলীফা তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে হযরত আম্মার (রা)-কে তদস্থলে গভর্নর নিয়োগ করেন (বুখারী, বাব কিরাআতিল ইমাম ওয়াল-মামুম)। এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মানুষকে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা বৈধ। তা না হলে হযরত উমার (রা) কুফাবাসীদের নালিশ শুনতে প্রস্তুত হতেন না। কারণ গীবত শোনাও গীবত করার সমতুল্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلْمُسْتَمِعُ شَرِيْكُ الْمُغْتَابِيْنَ .

"গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার।"

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমার (রা)-র নিকট লিখে পাঠালেন, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে, হযরত উমার (রা) তাকে উপদেশ দিলে হয়ত সে সংশোধন হয়ে যাবে। উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান ঃ

حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

"হা মীম। এই কিতাব (কুরআন) মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, প্রাচুর্যময়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন" (সূরা মুমিন ঃ ১-৪)।

আবু জানদাল পত্রান্তরে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন (ইমাম গাযালীর ইহ্‌য়া উলূমিদ-দীন, অধ্যায় গীবত)।

(তিন) লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশে গীবত করা জায়েয। কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশে তার গীবত করা বৈধ যে, তার দোষের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে দোষের কাজ পরিহার করবে।

এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নালিশ করলো। তিনি (স) তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। পুনরায় সে নালিশ করলে এবারও তিনি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। তৃতীয়বার সে তার প্রতিবেশীর গীবত করলে তিনি (স) বলেন ঃ তোমার ঘরের জিনিসপত্র বাইরে রাস্তায় ফেলে দাও। তোমার প্রতিবেশী তা দেখে লজ্জিত হয়ে তোমাকে কষ্ট দেয়া ত্যাগ করবে। সত্যিই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামত নিজের ঘরের মালপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। লোকেরা রাস্তা অতিক্রমকালে তাকে মালপত্র রাস্তায় নিক্ষেপের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, তার প্রতিবেশী তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রতিবেশীর কানে এ খবর পৌঁছলে সে লজ্জিত হয় এবং প্রতিবেশীর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় (ইহয়া উলুমিদ দীন, হুকূকুল জাওয়ার অধ্যায়)।

(চার) কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশে তার প্লট তৈরি করার জন্য কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কোন ব্যক্তি বললো যে, তার পিতা মারা গেছে এবং তার পিতার নিযুক্ত ওসী তাকে ঠিকমত খরচপাতি দিচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাকে ফতোয়া দান করুন। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, শারহু সহীহ মুসলিম, রদ্দুল মুহতার প্রভৃতি গ্রন্থে গীবতের এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত করলো যে, তিনি খুব কৃপণ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ ঠিকমত দেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তার অজান্তে তার মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণ ভরণপোষণ নিয়ে নাও (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নাফাকা)।

(পাঁচ) কোন আলেম, মুফতী বা সাধকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষক্রটি এই উদ্দেশে বর্ণনা করা যে, তিনি তাকে উপদেশ দান করবেন। ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে। গীবতের এই পন্থাও বৈধ। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লোকদের দোষক্রটি বর্ণনা করতেন কিন্তু তার দ্বারা মুসলমানদের অপমান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করবেন এবং ফলে সে সংশোধন হয়ে যাবে।

(ছয়) কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত থাকলে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে তাঁর গীবত করা বৈধ। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে না অথবা লোকদের উপর জুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই সাধক ও আলেমগণ স্বেরাচারী শাসকের গীবত করেন। নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত বৈধ বলা হয়েছে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ ঃ জালেম শাসক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি, বিদআতী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি যে অন্যদেরও বিদআত শিখায় (বায়হাকী থেকে দুররুল মানছূর গ্রন্থে)। হাসান বসরী (র)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (র) বলেন, গীবত চার প্রকার ঃ (১) এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তাকে বললো, গীবত করো না। সে বললো, এটা গীবত নয়, আমি তার যথার্থ দোষক্রটি বর্ণনা করছি। এই অবস্থায় গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কারণ হারামকে হালাল বলা কুফর। (২) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে এমন ভাষায় তার গীবত করলো যাতে শ্রোতারা বুঝে ফেললো যে, সে কার গীবত করেছে। এই পন্থায় গীবতকারী মোনাফিক। কারণ বাহ্যত সে গীবত পরিহার করলেও মূলত গীবতে লিপ্ত রয়েছে। (৩) কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নামোল্লেখ করে তার গীবত করলো এবং সে জানে যে, গীবত করা খারাপ। এই অবস্থায় সে গুনাহগার হবে। (৪) কোন পাপাচারী

ফাসেকের গীবত করা সওয়াবের কাজ। কারণ লোকেরা ফাসেকের এই বদনামি শুনে তার সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে।

গ্রন্থকার বলেন, ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা দুইটি কারণে বৈধ ঃ (১) সে লোকমুখে তার দুর্নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে। যে ব্যক্তি ফাসেক তাকে সালাম করা মাকরূহ। (২) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ফাসেকের কোন মর্যাদা নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ تَعَالٰى .

"যখন পাপাচারী ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান প্রভু অসন্তুষ্ট হন" (বায়হাকীর সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাব হিফজুল-লিসান)।

(সাত) এক ব্যক্তির দ্বারা অপর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সে অবহিত নয় যে, তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ, যাতে সে অন্য লোকের ক্ষতির কারণ না হয়। ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, নুযহাততুল মাজালিস, মাতালিবুল মুমিনীন, রদ্দুল মুহতার, শারহু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে গীবতের এই শ্রেণীকে অনুমোদন করা হয়েছে।

যেনম কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে উঠাবসা করছে। এই অবস্থায় তার সাথে উঠাবসা করার কারণে হয়ত কখনও আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ। অথবা বিচারকের আদালতে কেউ মোকদ্দমা দায়ের করলো। বিবাদী সাক্ষীগণের মিথ্যাচার, দোষত্রুটি ও অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। এই অবস্থায় আদালতের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া বিবাদীর জন্য বৈধ।

তবে মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোন ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ নয়। এ জাতীয় দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তাআলাও মানুষের সামনে দোষ প্রকাশকারীকে অপমানি করবেন (ইহ্য়া উলূমিদ্দীন)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ حَتّٰى يَفْتَضِحَ بِهَا فِىْ بَيْتِهِ .

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইয়ের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় আল্লাহ তাআলা তার দোষত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন, এমনকি তার ঘরেও তার দোষচর্চা হতে থাকবে" (নুযহাতুল মাজালিস, বাবুল ইহসান ইলাল ইয়াতীম)।

لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا الاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"কোন বান্দা পৃথিবীতে অপর বান্দার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষত্রুটি আড়াল করে রাখবেন" (সহীহ মুসলিম)।

(আট) যে ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে বেড়ায় এবং কেউ সমালোচনা করলে বা সতর্ক করলে তার কোন প্রভাব তার উপর পতিত হয় না এই ধরনের লোকের গীবত করা বৈধ।

এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়নমণি হযরত হুসায়েন (রা)-এর হত্যাকারীদের গীবত করতেন এবং তাদের ভৎসনা করতেন। কারণ তারা ছিল নির্লজ্জ এবং তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে করতো। গীবতের এই পন্থাকে ইহ্য়া উলূমিদ-দীন, আইনুল ইলম, দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে অনুমোদন করা হয়েছে।

مَنْ اَلْقٰى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلاَ غِيْبَةَ لَهُ .

"যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করলো তার দোষচর্চা গীবত নয়" (মোল্লা আলী আল-কারীর শারহু আইনুল ইলম)।

শেখ সাদী (র) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত করা বৈধ ঃ বেহায়া, স্বৈরাচারী শাসক এবং যার গোপন পাপাচার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়।

ইমাম হুসায়েন (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর ইরাকের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলো, পরিধেয় বস্ত্রে মশা-মাছির রক্ত লেগে

গেলে সেই বস্ত্রে নামায হবে কি না। ইবনে উমার (রা) হুসায়েন (রা)-র হত্যাকারীদের অভিসম্পাৎ করে বলেন, আল্লাহু আকবার। এই ইরাকীরা এতটা খোদাভীরু হয়ে গেল যে, মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করছে। অথচ তারাই ইমামকে হত্যা করে তাঁর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ "হাসান ও হুসায়েন এই পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল" (জামে আত-তিরমিযী, বাব মানাকিবিল হাসান ওয়াল হুসায়েন)।

(নয়) দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ। খিযানাতুর রিওয়ায়াত, তানবীরুল বাসাইর, রদ্দুল মুহতার ও সীরাতে আহমাদিয়া গ্রন্থে এই প্রকারের গীবত অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন আফসোস! অমুক ব্যক্তি নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না। কারো কোন খারাপ কাজে আক্ষেপ করা উত্তম। কোন মুসলমানকে শয়তানের নিকট পরাজিত হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখে তার অবস্থার প্রতি করুণা প্রকাশ করা উচিত। কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন, কোন ব্যক্তির দোষত্রুটি চর্চা করে তাকে অপমানিত করার উদ্দেশে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে, তবে আফসোস প্রকাশ করা হলে তা গীবত হবে না (খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

(দশ) কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ না করে তার গীবত করা বৈধ। বাযযাযিয়া, সীরাতে আহমাদিয়া, দুররুল মুখতার, খিযানাতুর রিওয়ায়াত ও তামবীহুল গাফিলীন গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

(এগার) কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাধিতে প্রসিদ্ধ হলে এবং তাতে তার কোন দোষের প্রতি ইঙ্গিত থাকলে তাকে সেই উপাধিতে স্মরণ করায় কোন দোষ নাই। কারণ ঐ উপাধিতে তার পরিচয় না দিলে লোকেরা তাকে চিনতে পারবে না। যেমন এক ব্যক্তি 'আরাজ' (বিকলাঙ্গ) উপাধিতে পরিচিত। মুহাদ্দিসগণ এই উপাধির একজন রাবীর হাদীস উক্ত উপাধিসহ বর্ণনা করেছেন। তবে যতটা সম্ভব উক্তরূপ উপাধিতে স্মরণ পরিহার করাই উত্তম। ইহয়া উলূমিদ্দীন, নুযহাতুল মাজালিস, রদ্দুল মুহতার, মাতালিবুল মুমিনীন ও শারহু সহীস মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে এই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে।

(বার) রদ্দুল মুহতার (শামী) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দীন ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন রাবী সম্পর্কে

বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদী, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবী। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

অনুরূপভাবে ফকীহগণ কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ তার রচনাকারী ফকীহ নন অথবা অমুক গ্রন্থের রচয়িতা মুতাযিলা, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় অথবা অমুক ব্যক্তি তার গ্রন্থে দুর্বল মাসআলাও বর্ণনা করেছেন অথবা অমুক ব্যক্তি তার কিতাবে মাওদূ (মনগড়া) রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করে নিজের গ্রন্থকে অনির্ভরযোগ্য করেছেন ইত্যাদি।

(তের) মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা এবং এর সাথে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা বৈধ। যেমন অমুক ব্যক্তি দোযখের উপযোগী, কারণ সে হাড়কিপ্টা কৃপণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে কৃপণতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। অথবা অমুক ব্যক্তি জীবদ্দশায় সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, মরার পর সে কবরে শাস্তি ভোগ করছে অথবা অমুক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, কারণ সে এই গুনাহ করেছিল। অথবা আমি স্বপ্নে অমুক ব্যক্তিকে এই শাস্তিতে নিমজ্জিত দেখেছি। এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে পাপাচারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গীদের বলেন ঃ কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একজন চোগলখোরি করার কারণে শাস্তি ভোগ করছে এবং অপরজন বেহায়ার মত জনসমক্ষে পেশাব করতো (তিরমিযী)।

নাজায়েয গীবতের সংজ্ঞা

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো ঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ।

গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ .

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)।

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক" (ইবনে আবিদ দুন্য়ার সীরাতে আহ্মাদিয়া)।

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنْ ثَلٰثِيْنَ زِنَةٍ فِى الْاِسْلاَمِ .

'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে

গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

এক কালের বলখের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

কাব ইবনে আহবার (রা) বলেন, আমি আগেকার নবীগণের কিতাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি ঃ "গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার তার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে" (ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারূক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ (ইহ্য়া উলূমিদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (তারগীব তারহীব)। কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়ার

সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কুকুর সাধারণত মৃত জীবের গোশত খায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'গীবত হচ্ছে পাপাচারীদের ভোজসভা' (নুযহাতুল মাজালিস)।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে" চোগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবত বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নববী (র) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাকে গীবত বলা হয়, তাই চোগলখোরি। কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষত্রুটি ফাস করে দেওয়াকে চোগলখোরি বলে। ইমাম গাযালী (র) ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উপরোক্ত কথাই পছন্দ করেছেন। কিন্তু হাদীসসমূহের আলোকে চিন্তা করলে প্রথমোক্ত মতই সঠিক মনে হয়। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

কোন কোন তাবিঈ বলেছেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামায-রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন (ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন)। তা সত্ত্বেও নামায সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং কোন কোন মনীষী রোযাকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কয়েকটি কারণে গীবত পরিহার করাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন।

যেমন নামায-রোযা আল্লাহ্ তাআলার এমন ইবাদত যা পরিত্যাগ করলে কেবল আল্লাহ্‌র অসন্তোষের শিকার হতে হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হয় এবং বান্দার অধিকারও খর্ব হয়। আল্লাহ্‌র নাফরমানি ক্ষমাযোগ্য। কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ ও করুণাময়। এমনকি তিনি তাঁর নাফরমান কাফের বান্দাদেরও সুখশান্তি দান করেন। গুনাহ্‌গার বান্দা দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র দরবারে মোনাজাত করলে, অনুতপ্ত হলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে

দিতে পারেন। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যে, তাতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ আল্লাহ্‌ পাক তার পাপ ক্ষমা করবেন না। কারণ সে গীবত করে এক ব্যক্তির মান-সম্মানে আঘাত হেনেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَوا الْاِسْتِطَالَةُ فِىْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

"অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সূদের পাপের চেয়েও মারাত্মক" (বায়হাকী)।

দ্বিতীয়তঃ পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

তৃতীয়তঃ প্রতিটি পাপাচারই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিশেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিশেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিশেধক মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন ঃ 'এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন' (ইবনে মাজা)। অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ اِثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ .

"আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি? তিনি বলেন ঃ

مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

"একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিস (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের জিনিস (যৌনাঙ্গ)" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন ঃ দুটি অঙ্গের কারণে—'মুখ ও যৌনাঙ্গ' (ইবনে মাজা)

لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

"তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, গীবত করো না এবং পার্থিব মোহে বিভোর হয়ে পড়ো না। আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও" (হাকেম, অধ্যায়-কিতাবুল বির ওয়াস-সিলাহ)।

গীবতের ক্ষতি

গীবতের দ্বারা প্রচুর ক্ষতি হয়, পার্থিব জগতেও পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ ঃ (এক) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-র নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা দোয়া করছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আটটি দোষ রয়েছে, ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয় না।

(১) তোমরা আল্লাহ্র মহত্ব স্বীকার করো কিন্তু তাঁর অধিকার আদায় করো না, তাঁর বিধানের আনুগত্য করো না।

(২) তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করো না।

(৩) তোমরা মুখে মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করো কিন্তু তাঁর হাদীস মোতাবেক জীবনযাপন করো না। অথচ ভালোবাসার দাবি এই যে, কাউকে ভালোবাসলে তার মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

(৪) তোমরা কথায় কথায় বলো যে, তোমরা মৃত্যুর ভয় করো কিন্তু তার প্রস্তুতি স্বরূপ ইবাদত করো না। অথচ কোন ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে।

(৫) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُواً .

'শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব শয়তানকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো' (সূরা ফাতির ঃ ৬)।

অথচ তোমরা অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রয়েছো এবং শয়তানকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছো।

(৬) তোমরা মুখে বলছো যে, তোমরা দোযখের ভয় করো কিন্তু নিজেরাই নিজেদের দোযখে নিক্ষেপ করছো।

(৭) তোমরা বেহেশতে যাওয়ার আকাঙ্খা জাহির করছো অথচ বেহেশতে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করছো না।

(৮) তোমরা অপরের দোষ চর্চা (গীবত) করছো অথচ নিজেদের দোষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছো না। এসব কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তাই তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমাত নাযিল হচ্ছে না এবং তোমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না।

(দুই) গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়েছে (তামবীহুল গাফিলীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)। একই সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন

ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমি তো পার্থিব জীবনে এই এই নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না! মহান আল্লাহ্ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছো। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে তুমি যার গীবত করেছো তার আমলনামায় যোগ করে দিয়েছি (তারগীব তারহীব)।

হাসান বসরী (র) জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর গীবত করছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম (নুযহাতুল মাজালিস)।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ দেউলিয়া কে তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই। তিনি (স) বললেন ঃ না অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিয়েছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদ কাজের দরুন সেই লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই হলো দেউলিয়া (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

(তিন) গীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ فِيْهَا ثَلَاثُ اٰفَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ .

"সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো। কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎকাজসমূহও কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ বর্ধিত হতে থাকে"(খিযানাতুর রিওয়ায়াত)।

(চার) গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না। যেমন উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

مَا النَّارُ فِى الْيَبِسِ بِاَسْرَعَ مِنَ الْغِيْبَةِ فِىْ حَسَنَاتِ الْعَبْدِ .

"বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না" (ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন)।

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সবশেষে। তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহ্‌র অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

(পাঁচ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকারীকে পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোযাদার ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহর ও আসরের নামায পড়লো। আসরের নামাযের পর তিনি তাদের বললেন ঃ তোমরা উভয়ে উযূ করে যোহর ও আসরের নামায পুনরায় পড়ে নাও এবং রোযারও কাযা করো। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন আমাদের জন্য এই হুকুম? তিনি বলেন ঃ তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছ (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল গীবাত)।

এক দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজ যেন কেউ আমার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোযাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের রোযা হয়নি। কারণ যে বক্তি দিনভর

মানুষের গোশত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোযা কিভাবে হতে পারে। তাদের দুইজনকে এখানে এসে বমন করতে বলো। তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি (স) তাদের একটি পাত্রে বমন করতে বলেন। তারা পুঁজ মিশ্রিত রক্তবমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই দুই নারী সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা উযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযাও বাতিল হয়ে যায়। তা হলে ঃ গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত। এই চারটি জিনিস পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো ঃ মিথ্যাচার, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো (ইহ্‌য়া উলূমুদ্দীন, রোযা অধ্যায়)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

"যে ব্যক্তি (রোযা থেকেও) মিথ্যাচার ত্যাগ করতে পারলো না তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না" (তিরমিযী)।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার রোযার কোন মূল্য ও মর্যাদা দেন না। মোল্লা আলী আল-কারী (র) মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাওলায-যূর' অর্থ বাতিল কথা, তা মিথ্যাই হোক অথবা গীবত অথবা চোগলখোরি, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন ঃ

كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ اِلاَّ الْجُوْعَ وَالْعَطْشَ .

"কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না" (ইহ্‌য়া উলূমিদ্দীন, সাওম অধ্যায়)।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)। আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছূর)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْدَاءَ فِىْ قَلْبِهِ .

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়" (ইবনে মাজা)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্য থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার হতে পারে (বিষয়টি ইমাম গাযালীর নিবন্ধে বিস্তারিত দেখুন)।

গীবতের কাফফারা

নিজের বাকশক্তিকে সংযত রাখা মানুষের কর্তব্য। তাহলে সে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ঈমান, আমল ও আখেরাত বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গীবত হয়ে যায়, তবে সাথে

সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। অনন্তর যার গীবত করা হয়েছে, অকপটে তার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ গীবত এমন একটি অপরাধ যেখানে আল্লাহর অধিকারও ক্ষুণ্ন হয় (তাঁর নির্দেশ লংঘিত হয়) এবং বান্দার অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়। এজন্য আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করার সাথে সাথে বান্দার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় ভাগ

গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান

—সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

আমার নিকট কয়েকটি সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা এসেছে যার মধ্যে কতক লোকের আপত্তিসমূহের উল্লেখপূর্বক তার জওয়াব চাওয়া হয়েছে। আমার পক্ষে আপত্তিকারীদের শত্রু হওয়া তো মুশকিল। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে টানাহেঁচড়া করা হয় তখন তার সংশোধন অপরিহার্য মনে হয়, যাতে সাধারণ লোক এবং অর্ধশিক্ষিত লোক এসব মাসআলা অনুধাবনে ভুল না করে। এজন্য আমি এই প্রশ্নমালা থেকে আসল ও মৌলিক বিষয়গুলো বেছে নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে তার উত্তর দিচ্ছি। নিম্নে শুধুমাত্র গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ১. গীবতের সঠিক সংজ্ঞা কি?

২. গীবতের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা কতটা সঠিক?

'কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার কোন প্রকৃত দোষের কথা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করছে এবং সাথে সাথে আকাঙ্খা পোষণ করছে যে, সে যার দোষ বর্ণনা করছে সে তার এই কাজ (দোষচর্চা) সম্পর্কে অবহিত না হোক।'

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সংজ্ঞা এই দাবি সহকারে পেশ করা হয়েছে যে, হাদীস শরীফে মহানবী (স) থেকে গীবতের যে সংজ্ঞা উল্লেখিত হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যার কারণে কোন ব্যক্তি গীবতের সীমা নির্ধারণে ভুলের শিকার হতে পারে। আরও এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ নয়।

৩. গীবতের শরীআত অনুমোদিত শ্রেণীসমূহ কি কি এবং কেন তা জায়েয রাখা হয়েছে? তা বৈধ হওয়ার ভিত্তি কি এই যে, তা মূলতই গীবত নয় অথবা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে একটি অবৈধ জিনিসকে বৈধ করা হয়েছে?

৪. এ কথা কি ঠিক যে, মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষক্রটি যাচাই করেছেন?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا .

"হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখো" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)।

৫. মুহাদ্দিসগণ স্বয়ং এই কাজ সম্পর্কে কি বলেন?

প্রবন্ধকারের জবাব

শরীআত প্রণেতা প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা

১. প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে, স্বয়ং শরীআত প্রণেতার প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞাই সঠিক ও যথার্থ। সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নোক্ত বাক্যে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ . قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

"গীবত এই যে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের উল্লেখ করলে যা তার অপছন্দনীয়। বলা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবিকই তা (দোষ) থেকে থাকে? এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন ঃ তুমি যা বলেছ প্রকৃতই তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বললে তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।"

একই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম মালেক (র) মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে তাঁর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْغِيْبَةُ فَقَالَ اَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اَنْ يَّسْمَعَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ اِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَاكَ الْبُهْتَانُ .

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব আল-মাখযূমী (রা) অবহিত করেন যে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলো, গীবত কি? তিনি বলেন ঃ তুমি কোন ব্যক্তির উল্লেখ এমনভাবে করলে যে,

তা শুনলে সে অপছন্দ করবে।[১] সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা যদি সত্য হয়? তিনি বলেন ঃ তুমি যদি বাতিল (মিথ্যা) কথা বলো তবে তা তো অপবাদ"।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত বাণীর আলোকে মহান আলেমগণ গীবতের শরীআত সম্মত অর্থ করেন ঃ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিকৃষ্ট কথা সহকারে তার উল্লেখ করা"।

ইমাম গাযালী (র) বলেন,

حَدُّ الْغِيْبَةِ اَنْ تَذْكُرَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَهُ .

"গীবতের সংজ্ঞা এই যে, তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে যে, তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে"।

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র) গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَنْ تَذْكُرَ الْاِنْسَانَ فِىْ غَيْبَةٍ بِسُوْءٍ كَانَ فِيْهِ .

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তুমি তার দুর্নাম করলে, যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে"।

ইমাম নববী (র) এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ.......... سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِاللَّفْظِ اَوْ بِالْاِشَارَةِ وَالرَّمْزِ .

"কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে...... চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক অথবা ইশারা-ইংগিতে"।

---

১. কেউ যেন ভ্রান্তির শিকার না হয় যে, এ হাদীসে 'অনুপস্থিতিতে' কথার উল্লেখ নাই, তাই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সামনাসামনি খারাপ কথা বলাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। '*গীবত*' শব্দটির মধ্যেই স্বয়ং 'অনুপস্থিতিতে' অর্থ বর্তমান রয়েছে। অতএব গীবতের সংজ্ঞা হিসাবে যখন কোন কথা বলা হবে তখন তার মধ্যে স্বয়ং উপরোক্ত অর্থ নিহিত থাকবে, চাই তা পরিস্কারভাবে বলা হোক বা না হোক (প্রবন্ধকার)।

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী (র) বলেন ঃ

هِيَ اَنْ يَّذْكُرَ الانْسَانُ عَيْبَ غَيْرِهٖ مِنْ غَيْرِ مَحُوْجٍ اِلٰى ذِكْرِ ذَالِكَ .

"নিষ্প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) বলেন,

اَلْغِيْبَةُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ خَلْفَ اِنْسَانٍ بِمَا يَغُمُّهُ لَوْ سَمِعَهُ وكَانَ صِدْقًا اِذَا كَانَ كَذِبًا فَيُسَمّٰى بُهْتَانًا .

"গীবত এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে– তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ"।

ইবনুত-তাইন (র) বলেন ঃ

اَلْغِيْبَةُ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ .

"গীবতের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী (র) প্রদত্ত সংজ্ঞা ঃ

اَلْغِيْبَةُ اَنْ تَتَكَلَّمَ خَلْفَ الْاِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ وَلَوْ كَانَ صِدْقًا ·

"গীবত এই যে, তুমি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে– যদিও তা সত্য হয়।"

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) গীবত ও চোগলখোরি সম্পর্কে বলেনঃ

اَلْغِيْبَةُ تُوْجَدُ فِىْ بَعْضِ صُوَرِ النَّمِيْمَةِ وَهُوَ اَنْ يَّذْكُرَهُ فِىْ غَيْبَةٍ بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَسُوْءُهُ قَاصِدًا بِذَالِكَ الافْسَادَ .

"চোগলখোরির কোন কোন পর্যায়ের মধ্যে গীবতও পাওয়া যায়। তা এই যে, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষ বর্ণনা করে যা তার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, আর এই বর্ণনার উদ্দেশ্য বিবাদ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা"।

অভিধান, হাদীস ও ফিক্‌হের এই ইমামগণের মধ্যে কেউই একটি শরঈ বিষয়ের যে সংজ্ঞা স্বয়ং শরীআত প্রণেতা প্রদান করেছেন তাকে অপূর্ণাঙ্গ ও ক্রটিপূর্ণ সাব্যস্ত করে জবাবে নিজেদের প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রদান করার দুঃসাহস করেননি।

মূলত শরীআত প্রণেতাকে অতিক্রম করে শরীআতের কোন পরিভাষার তাৎপর্য বর্ণনার অধিকার কারও নেই। শরীআত প্রণেতা যখন একটি পরিষ্কার প্রশ্নের পরিষ্কার বাক্যে জবাব প্রদান করেছেন তখন একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের এ কথা মেনে নিতেই হবে যে, এটাই তার সঠিক অর্থ। মুসলমান তো দূরের কথা একজন অমুসলিম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এ কথা বলার দুঃসাহস করে না যে, শরীআত প্রণেতা শরীআতের একটি পরিভাষার যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক নয়, বরং আমি যে অর্থ করেছি তা সঠিক। এটি এমন একটি অযৌক্তিক কথা যেমন একটি আইন পরিষদ স্বয়ং তাদের প্রণীত আইনের কোন পরিভাষার অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, আর কোন ব্যক্তি আইন বিশেষজ্ঞ হওয়ার দাবিদার বনে বলে যে, উল্লেখিত আইনে ঐ বিষয়ের আসল সংজ্ঞা তা নয় যা আইন পরিষদ বর্ণনা করেছে, বরং আমার প্রদত্ত সংজ্ঞাই সঠিক।

আপত্তিকারীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার ক্রুটি

(২) দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই যে, আপনি গীবতের যে সংজ্ঞা নকল করেছেন তা না পূর্ণাঙ্গ, না অর্থপূর্ণ। তার মধ্যে এমন কতগুলো গীবত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী বৈধ এবং কতিপয় গীবত তার বাইরে থেকে যায় যা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী হারাম। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন, এক ব্যক্তি কারো কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। আপনার জানা আছে যে, সে অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক। আপনি মেয়ের পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ চরিত্রের লোক। আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেয়ের পিতা তাকে খারাপ লোক জেনে নিজের জামাতার যোগ্য মনে করবে না। সাথে সাথে আপনি মেয়ের পিতাকেও তাকিদ করে বলে দিলেন যে, খবরদার! তার সম্পর্কে আমি আপনাকে যা বলেছি তা যেন সে জানতে না পারে। এই বিষয়টি যদিও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীআতে বৈধ ও অনুমোদিত রাখা হয়েছে, কিন্তু আপনার উদ্ধৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী তা হারামকৃত গীবতের আওতায় এসে যায়। কারণ তাতে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা এবং গোপনীয়তা উভয়ই বর্তমান আছে। অপরদিকে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে–যে কেবলমাত্র মুখরোচক কথা ও ঠাট্টা-উপহাসোচ্ছলে নিজের বন্ধুদের মধ্যে বসে

কোন কোন লোকের দোষ বর্ণনা করে। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য তার নেই (শ্রোতাদের দৃষ্টিতে সে নিম্নস্তরের হোক না কেন) এবং সে এও পরোয়া করে না যে, তার এ কথা তাদের কানে পৌঁছে যায় কি না। এই জিনিস নিঃসন্দেহে শরীআতে হারাম, কিন্তু তা গীবতের উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কারণ তার মধ্যে না হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছা বর্তমান আছে আর না গোপন করার আকাঙ্খা।

শুধু তাই নয়, শরীআত প্রণেতা যে জিনিস সুস্পষ্টভাবে হারাম গীবতের অন্তর্ভূক্ত করেছেন তাও উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতার বাইরে থেকে যায়। হাদীসে এসেছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামীকে যেনার অপরাধে যখন রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হলো তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলতে চলতে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন, উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি বলছিল যে, 'দেখ ঐ ব্যক্তিকে! আল্লাহ তাআলা তার অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু তার নিজের নফস তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়।' কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার পাশে একটি গাধা পড়ে থাকতে দেখা গেলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে ডেকে বলেন ঃ 'আসো এবং এ গাধার গোশত খাও।' তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কে খেতে পারে? তিনি বলেন ঃ

فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ اَخِيْكُمَا اٰنِفًا اَشَدُّ مِنْ اَكْلِ مِنْهُ .

"এইমাত্র তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ইজ্জতের উপর যে হস্তক্ষেপ করলে তা এই মরা গাধার গোশত খাওয়ার তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট" (আবু দাউদ)।

এই ঘটনায় স্বয়ং শরীআত প্রণেতা (স) গীবত হারাম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আপনার উদ্ধৃত সংজ্ঞায় বর্ণিত দু'টি শর্তই উল্লেখিত গীবতে অনুপস্থিত। দুই ব্যক্তির যে কথোপকথন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার বাক্য থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, হযরত মায়েয (রা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তারা এজন্য আক্ষেপ করে বলেছেন যে, তার যে অপরাধ আল্লাহ তাআলা গোপন রেখেছিলেন, তিনি কেন তা পুনঃ পুনঃ উল্লেখপূর্বক স্বীকার করতে গেলেন এবং রজমের মত ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলেন। গোপন রাখার আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে তার প্রশ্নই উঠে না। কারণ যে ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছিল তিনি তো পৃথিবী থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছেন।

হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ হওয়ার মূলনীতি

৩. তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া আপনার জন্য জরুরী মনে করি। শরীআতে যেসব জিনিস হারাম তথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা যদি কোন অবস্থায় বৈধ হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, সংশ্লিষ্ট জিনিসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়েছে। বরং তার কারণ এই যে, একটি বিরাট কল্যাণ ও প্রয়োজন তা বৈধ হওয়ার দাবি করছে। ঐ কল্যাণ ও প্রয়োজন যদি তার দাবিদার না হতো তবে তা পূর্ববৎ হারামই থাকতো। যতক্ষণ ও যে সীমা পর্যন্ত এই কল্যাণ ও প্রয়োজনের দাবি থাকে ততক্ষণ ও সেই সীমা পর্যন্ত তা বৈধ হয় ও বৈধ থাকে। ঐ প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস পুনরায় সস্থানে হারাম হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, মৃতজীব, রক্ত, শূকর, শরাব এবং যে হালাল প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যবেহ করা হয়েছে, এ সবই আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন। মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য উপরোক্ত কোন জিনিস যদি সাময়িকভাবে বৈধ করা হয় তবে তা এই কারণে নয় যে, ঐ সময় মৃতজীব মৃত থাকে না, রক্ত আর রক্ত থাকে না অথবা শূকর বকরী হয়ে যায়। তা বৈধ হওয়ার কারণ শুধুমাত্র এই যে, “মানুষের জীবন নষ্ট করাটা এসব হারাম জিনিসের ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি খারাপ”। এই খারাপ থেকে বাঁচার জন্য যে সময় ও সীমা পর্যন্ত তার ব্যবহার অপরিহার্য হয়, ঐ সময় ও সীমা পর্যন্ত তা আহার করা বৈধ করা হয়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিষিদ্ধ হওয়াটা সব সময় এই দাবি করতে থাকে যে, প্রয়োজনের সীমা যেন চুল পরিমাণও অতিক্রম না করা হয়।

এই মৌল ও নীতিগত সত্যকে সামনে রেখে এখন আপনি তৃতীয় মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করুন ঃ শরীআত প্রণেতার বর্ণিত সংজ্ঞার আলোকে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা স্বয়ং একটি খারাপ কাজ এবং শরীআতের দৃষ্টিতে একটি গুনাহের কাজ। এই পাপকাজ যদি কখনও বৈধ, নেক অথবা সওয়াবের বিষয় হতে পারে তবে তা কেবলমাত্র এই কারণে যে, একটি প্রকৃত প্রয়োজন তার দাবিদার, তা এমন প্রয়োজন যা পূরণ না করলে গীবতের নিকৃষ্টতা থেকেও নিকৃষ্টতর কাজ সংঘটিত হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় তা বৈধ হওয়ার কারণ এই

নয় যে, তা মূলতই গীবত নয় অথবা তা মূলতই হারাম নয়, বরং এর কারণ কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের সেই সব প্রয়োজন যা শরীআতের দৃষ্টিতে অতীব মূল্যবান। এসব প্রয়োজনের মধ্যে কোন প্রয়োজন গীবতের দাবিদার না হলে অনুপস্থিতিতে কারো বদনামী করা কোন ভালো কাজ নয় যে, শরীআত তা নিষ্প্রয়োজনে সাধারণভাবে বৈধ করে রাখবে।

গীবত থেকে ব্যতিক্রম করার ভিত্তি

গীবতের অবৈধতা থেকে যেসব জিনিস ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে তার সর্বপ্রথম ভিত্তি শরীআত প্রণেতার নিম্নোক্ত নীতিগত বাণী ঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبَا الْاِسْتِطَالَةُ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ “নিকৃষ্টতম বাড়াবাড়ি হচ্ছে, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করা” (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল গীবাত)।

এই ‘অন্যায়ভাবে’ (بغير حق) শব্দটির ব্যবহার দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, ‘ন্যায়ের’ (حق) খাতিরে তা করা জায়েয। পুনরায় এই ‘ন্যায়’-এর ব্যাখ্যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দৃষ্টান্ত থেকেই জানা যায়। যেমন ঃ

এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযে শরীক হলো। নামায শেষ হতেই সে এই কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল, “হে আল্লাহ! আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দয়া করুন, আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এই দয়ায় শরীক না করুন।” মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ

اَتَقُوْلُوْنَ هُوَ اَضَلُّ اَمْ بَعِيْرُهُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰى مَا قَالَ .

“তোমরা কী বলো, এই ব্যক্তি অধিক নাদান না তার উট? তোমরা কি শুনতে পাওনি সে কি বলেছে?” (আবু দাউদ)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-র এখানে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ হচ্ছে স্বগোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর তিনি বের হয়ে আসেন এবং সাক্ষাতপ্রার্থীর সাথে ভদ্র ব্যবহার করেন। ঘরের ভেতর ফিরে এলে আয়েশা (রা) আরয করেন, আপনি তো তার সাথে নম্র ব্যবহার করলেন। অথচ বের হয়ে যাওয়ার সময় তার সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

"যার অশিষ্ট ব্যবহারের ভয়ে লোকেরা তার সাথে মেলামেশা ত্যাগ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট তার স্থান হবে সর্বনিকৃষ্ট" (বুখারী, মুসলিম)।

ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআবিয়া (রা) ও আবুল জাহম (রা) উভয়ে তাঁর নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠান। তিনি এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমত জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ

اَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ وَاَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ .

"মুআবিয়া, সে তো দরিদ্র ব্যক্তি, তার কোন সম্পদ নাই। আর আবুল জাহম, সে তো স্ত্রীদের খুব মারে"(বুখারী, মুসলিম)।

আবু সুফিয়ান (রা)-র স্ত্রী হিন্দ এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তিনি আমাকে ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন না (বুখারী, মুসলিম)।

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

এই ধরনের নজীরসমূহ থেকে ফকীহগণ ও মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি গ্রহণ করেছেন ঃ যে 'ন্যায় ও সত্যের' কারণে কোন ব্যক্তির জন্য খারাপ কাজ বৈধ

হয় তার অর্থ এমন সব প্রকৃত প্রয়োজন যার জন্য এরূপ করা ছাড়া উপায় নেই। পুনরায় এই মূলনীতির ভিত্তিতে তাঁরা সুনির্দিষ্ট করে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে গীবত করা যেতে পারে অথবা করা উচিত। আল্লামা ইবনে হাজার (র) তাঁর বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে (ফাতহুল বারী) ঐসব ক্ষেত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ 'বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীআতের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই (গীবত করার মাধ্যমে) অর্জিত হতে পারে। যেমন জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোন খারাবী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোন শরঈ মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায়বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোন কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা.... বিবাহ ও দৈনন্দিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোন ফিক্‌হের ছাত্রকে কোন ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি" (ফাতহুল বারী, ১০খ, পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী (র) মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে ও রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সৎ ও শরীআত সম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে কোন দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে। এর অধিকাংশের উপর আলেমগণের ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে মশহুর হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করা হয়েছে।

প্রথম কারণ ঃ জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব লোকের কাছে যালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে পারে যাদের যালেমকে দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এ ক্ষেত্রে সে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎকাজের মাধ্যমে গুনাহের কাজের সুযোগ বন্ধ করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার

উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে, যার দ্বারা খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে তার বিরুদ্ধে, এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি এই রকম কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এই রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হারাম।

তৃতীয় কারণ ঃ কোন বিষয়ে ফতওয়া চাওয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা, আমার উপর আমার বাপ, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এইভাবে জুলুম করছে। তার জন্য এসব করা কি উচিৎ? তার জুলুম থেকে আমার বাঁচার অধিকার আদায় করার এবং জুলুম প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে। প্রয়োজন বশত এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হলো এভাবে বলা যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? কারণ এভাবে বললে কাউকে নির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তির নামোল্লেখ করাও জায়েয। যেমন হিন্দ আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

চতুর্থ কারণ ঃ মুসলমানদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা এবং উপদেশ দেওয়া। এটা কয়েকভাবে হতে পারে ঃ

(ক) হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষক্রটি আছে তা যাচাই বাছাই করে বলে দেওয়া। মুসলমানদের ইজমা'র ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিবও। যেমন কোন লোককে বিবাহের ব্যাপারে, কারো সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেনদেনের ব্যাপারে কিংবা কাউকে প্রতিবেশী বানানোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করে বরং নসীহতের নিয়াতে খারাপ দিকগুলো উল্লেখ করা। যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, সে শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোন ফাসেক ব্যক্তিকে তার কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই সুযোগে তার ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশঙ্কা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে

হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

(খ) কোন লোককে কোন বিষয়ে জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল বানানো হলো কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত অথবা সে ফাসেক বা অলস ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব রয়েছে এবং যে ইচ্ছা করলে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অন্য কোন যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা দেখিয়ে দিবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে, এইরূপ লোকের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ বলা বৈধ। এতে উর্ধতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে এ কথাও বলতে পারে যে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

পঞ্চম কারণ ঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদআতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর জুলুম করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় ইত্যাদি। এই ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তার কৃত কুকর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলা জায়েয নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ কারণ ঃ পরিচয় দেওয়া ঃ কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া জায়েয। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি। এভাবে কারো পরিচয় দেওয়া জায়েয। তবে খাট করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে সেটাই উত্তম।

উলামায়ে কেরাম এই ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে এসবের দলীল প্রমাণ রয়েছে (সহীহ মুসলিম)।

এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের বর্ণনাসমূহ থেকে দু'টি জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। (এক) গীবতের যেসব পন্থা জায়েয অথবা অপরিহার্য বলা হয়েছে তা জায়েয বা অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই নয় যে, তা মূলতই গীবত নয়। বরং তার কারণ

হচ্ছে শরীআতের যথার্থ ও সঠিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, যার জন্য একটি প্রকৃতই হারাম জিনিস প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত বৈধ বা অপরিহার্য করা হয়েছে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই হারাম জিনিসের বৈধতাকে ঐ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি বের করে তার ভিত্তিতে এমন কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন যার দৃষ্টান্ত সুন্নাতে বর্তমান নেই।

মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক হাদীসের রাবীগণের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি যাচাইয়ের ভিত্তি

৪. এখন চতুর্থ প্রশ্নটি নেয়া যাক। কুরআন মজীদের যে আয়াত সম্পর্কে বলা হয় যে, মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনাকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও দোষত্রুটি (جرح وتعديل) পর্যালোচনার যাবতীয় কাজ উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে করেছেন তার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসেক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)।

এ আয়াতের দাবি এই যে, "কোন ফাসেক ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসলে তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সেই খবরের সত্যতা যাচাই করে দেখো যে, তা সঠিক কি না"। অথচ মুহাদ্দিসগণ রাবীগণের চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়নের যে কাজ করেছেন তা এই যে, "কোন ব্যক্তি যখন তোমাদের নিকট খবর নিয়ে আসে তখন তার চরিত্র ও কার্যকলাপের মূল্যায়ন করো। যদি সে দুষ্কর্মপরায়ণ হয় তবে শুধুমাত্র তার খবরই প্রত্যাখ্যান করো না, বরং সাধারণ্যে প্রচারও করে দাও যে, অমুক ব্যক্তি দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতিপরায়ণ, তার পরিবেশিত তথ্য গ্রাহ্য করো না"।

এই দু'টি কথা পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য করুন, আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কি এই সাক্ষ্য দেয় যে, শেষোক্ত কথাগুলো পূর্বোক্ত কথাগুলোর অনুরূপ এবং তার কোন অংশ পূর্বোক্ত কথার বিপরীত নয়?

মূলত এই দলীল পেশ করার সময় এ কথা হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করা হয়নি যে, রাবীগণের চরিত্র ও কার্যক্রমের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কাজের ধরন কি ছিল? এ কাজের একটি অংশ এই ছিলো যে, যেসব লোক মিথ্যাবাদী অথবা ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী অথবা কোন দিক থেকে অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য তাদের পরিবেশিত খবর সমর্থন করা যাবে না। এর দ্বিতীয় অংশ এই ছিলো যে, সাধারণ লোককে এবং হাদীসের শিক্ষার্থীদের এ ধরনের রাবীদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং বই-পুস্তকে তাদের দোষত্রুটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকে। উপরোক্ত আয়াত এবং অন্যান্য নস (কুরআন-হাদীসের দলীল) থেকে কেবল প্রথম অংশের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব ইমাম মুসলিম (র) সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এই অংশের সমর্থনে তা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয় অংশের সমর্থনে কোন নস বর্তমান নাই, বরং তাকে গীবত হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তা বৈধ ও অপরিহার্য হওয়ার সমর্থনে সকল মুহাদ্দিস এই প্রমাণ পেশ করেন যে, যদি এ কাজ না করা হয় তবে মিথ্যাবাদী, বিদআতী ও দুর্বল রাবীদের বর্ণিত ভ্রান্ত রিওয়ায়াত থেকে মুসলমানদের দীনকে রক্ষা করা যাবে না। এ ব্যাপারে ইমাম নববী (র) ও ইবনে হাজার (র)-এর বর্ণনা আপনি এইমাত্র উপরে দেখেছেন। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের নিজস্ব ব্যাখ্যা

৫. পাঁচ নম্বর প্রশ্নের জবাব এই যে, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউই নিজের কাজের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে না এ কথা বলেছেন যে, তা গীবত নয়, আর না এই প্রমাণ পেশ করেছেন যে, আমাদের এ কাজের অনুমতি অমুক আয়াত অথবা অমুক হাদীসে দেওয়া হয়েছে। বরং তাঁরা বলেন যে, দীন ইসলামকে বিকৃতি থেকে রক্ষার জন্য এবং মুসলিম সর্বসাধারণকে অনির্ভরযোগ্য রাবীদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ করার জন্য এই গীবতে লিপ্ত হওয়া জায়েয, বরং অপরিহার্য। যে যুগে রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয় ঐ সময় প্রবলভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের এই গীবত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রাবীদের বিশ্বস্ততা যাচাইকারী মুহাদ্দিস ইমামগণ নিজেদের সঠিক অবস্থান পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত করার জন্য স্বয়ং যেসব কথা বলেছিলেন তা দেখে নিন।

মুহাম্মাদ ইবনে বুনদার (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বললাম, আমার একথা বর্ণনা করতে অত্যন্ত ভয় হচ্ছে যে, অমুক রাবী দুর্বল এবং অমুক মিথ্যাবাদী। ইমাম সাহেব বলেন ঃ

اِذَا سَكَتَّ اَنْتَ وَسَكَتُّ اَنَا فَمَتٰى يَعْرِفُ الْجَاهِلُ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقِيْمِ

"তুমিও যদি নীরব থাকো এবং আমিও যদি নীরব থাকি তবে অজ্ঞ লোকেরা কিভাবে সহীহ ও ভ্রান্ত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করবে?"

আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন, আমার পিতা হাদীস ও রাবীদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, অমুক ব্যক্তি দুর্বল এবং অমুক ব্যক্তি বিশ্বস্ত। আবু তুরাব বাখশী বলেন, হে শায়খ! আলেমগণের গীবত করো না। এ কথার উত্তরে আমার পিতা বলেন, "আমি কল্যাণ কামনা করছি, গীবত করছি না"।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) এক রাবী সম্পর্কে বলেন, সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে। এক সূফী আপত্তি করেন যে, এতো আপনি গীবত করছেন। ইবনুল মুবারক (র) জবাব দিলেন,

اُسْكُتْ اِذَا لَمْ نُبَيِّنْ كَيْفَ يُعْرَفُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ .

"চুপ থাকো, আমরা যদি এ কথা বর্ণনা না করি তবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে"?

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (র)-কে বলা হলো, আপনার ভয় হচ্ছে না যে, আপনি যেসব লোকের দোষত্রুটি বর্ণনা করেছেন তারা কিয়ামতের দিন আপনাকে পাকড়াও করবে? তিনি জবাব দেন, তারা যদি আমাকে পাকড়াও করে তবে তা আমার জন্য সহজ ব্যাপার হবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকড়াও-এর তুলনায়। কারণ সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আঁচল টেনে ধরে বলবেন, যে হাদীস সম্পর্কে তুমি জানতে যে, তা মিথ্যা এমন হাদীস তুমি আমার নামের সাথে সম্পৃক্ত হতে দিলে কেন? তখন আমি কী বলবো?

শোবা ইবনুল হাজ্জাজ (র)-কে বলা হলো, আপনি কতক লোকের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাদের অপমান করলেন। ভালো হতো যদি আপনি তা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি বলেন, আমাকে আজকের একটি রাত অবকাশ দাও যাতে আমি আমার ও আমার স্রষ্টার মধ্যে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারি যে, এ কাজ আমার জন্য ত্যাগ করা কি জায়েয? পরবর্তী দিবসে তিনি বের হয়ে বলেন ঃ

قَدْ نَظَرْتُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَالِقِىْ فَلاَ يَسْعَنِىْ دُوْنَ اَنْ اُبَيِّنَ اُمُوْرَهُمْ لِلنَّاسِ وَلِلاِسْلاَمِ .

"আমি আমার ও আমার সৃষ্টিকর্তার মাঝখানে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। জনগণের উপকারার্থে এবং ইসলামের জন্য ঐসব বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নাই।"

আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী (র) বলেন, আমি ও শোবা পথ চলাকালে এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখলাম। শোবা বলেন ঃ

كَذَبَ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِىْ اَنْ اَسْكُتَ عَنْهُ لَسَكَتُّ .

"আল্লাহ্‌র শপথ! সে মিথ্যা বলছে। এ সম্পর্কে নীরব থাকাটা আমার জন্য বৈধ নয়, অন্যথায় আমি নীরব থাকতাম।"

এই শোবার বিভিন্ন ছাত্র বলতেন যে, তিনি রাবীদের দোষক্রটি নির্দেশ (جرح)-কে "আল্লাহ রাস্তায় গীবত" অথবা "আল্লাহ্‌র জন্য গীবত" বলে আখ্যায়িত করতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শোবা (র) বলতেন ঃ

تَعَالَوْا حَتّٰى نَغْتَابَ فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

"আসো আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে আমরা কিছু গীবত করি।"

আবু যায়েদ আনসারী (র) বলেন, একদিন আমরা শোবা (র)-র নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আজ হাদীস বর্ণনা করার দিন নয়, আজ গীবত করার দিন। আসো মিথ্যাবাদীদের কিছুটা গীবত করি।[২]

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর আস-সাহীহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় রাবীগণের চরিত্র ও কার্যাবলীর মূল্যায়ন (جرح وتعديل) করার এই কাজের সমর্থন করে লিখেছেনঃ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যে কারণে হাদীসের রাবী ও খবর পরিবেশনকারীদের দোষক্রটি প্রকাশের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসাকারীদের এ কাজের বৈধতা সম্পর্কে ফতোয়া দান করেছেন তা ছিলো এই যে, তা না করলে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কেননা দীন ইসলামের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হয়, অথবা তাতে কোন কাজের নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হবে। কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা না থাকে, আর অন্য রাবী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তার সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তার সম্পর্কে অনবহিত লোকদের সামনে যদি তার দোষক্রটি তুলে না ধরে তবে সে গুনাহগার হবে এবং মুসলিম জনসাধারণের সাথে প্রতারণাকারী গণ্য হবে। কারণ এসব হাদীস যারা শুনবে তারা তদনুযায়ী বা তার কোন একটি অনুযায়ী আমল করবে। অথচ এর সবগুলো বা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা" (বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১খ, পৃ. ৫৪-৫)।

এ হচ্ছে রাবীদের দোষক্রটি উম্মোচিত করার পক্ষে একজন মহান হাদীসবেত্তার যুক্তিপ্রমাণ। উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) লিখেছেন, "জেনে রাখো! রাবীদের দোষক্রটি নির্দেশ করা সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী জায়েয, বরং অপরিহার্য। কারণ মহান শরীআতকে (মিশ্রণ থেকে) রক্ষার প্রয়োজন তা দাবি করে। আর এ কাজ হারামকৃত গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত। সম্মানিত ইমামগণ, তাদের প্রবীণগণ এবং তাদের মধ্যে যাঁরা তাকওয়া-পরহেযগারীতে খ্যাতিমান ছিলেন তাঁরা এ কাজ করতে থাকেন" (সহীহ্ মুসলিমের আরবী ভূমিকা, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির নিচে) (তরজুমানুল কুরআন, জুন ১৯৫৯ খৃ.)।

---

২. এই সমস্ত ঘটনা ও বক্তব্য আল-খাতীব আল-বাগদাদী (র) তাঁর আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়াইয়া শীর্ষক গ্রন্থে নকল করেছেন, পৃ. ৪৩-৪৬ দ্র. (প্রবন্ধকার)

গীবত সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা

গীবত সম্পর্কে আমার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি পুনরায় লিখেন ঃ

"১৯৫৯ সনের জুন সংখ্যায় "তরজুমানুল কুরআন" পত্রিকায় গীবত ও তার হুকুম সম্পর্কে আপনি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন তা অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু এরপর পুনরায় এমন কিছু আলোচনা দৃষ্টিগোচর হলো যা চিন্তা ও মন-মানসিকতায় জটিলতার সৃষ্টি করে। আপনি কি এ ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত কথা বলে দিতে পারেন না যাতে দুই+দুই=চার-এর মত তার যথার্থ শরঈ মর্যাদা প্রতীয়মান হয় এবং লোকেরা অতঃপর আর কোন জটিলতার শিকার হবে না?"

এই প্রসংগে কোন কোন প্রশ্নের জওয়াব ইতিপূর্বে চরম আন্তরিক অনিচ্ছার সাথে দিয়েছিলাম। এখন আবার সেই অনিচ্ছা সহকারে আরও দু'টি প্রশ্নের জওয়াব দান করে নিজের সীমা পর্যন্ত এই আলোচনা চিরদিনের জন্য সমাপ্ত করতে চাই। যতটা নিম্নস্তরে অবতরণ করে এই আলোচনা করা হচ্ছে তা সবার সামনেই রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের ভুল বুঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার জন্যও একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এই ধরনের আলোচনার প্রতিবাদ করা কঠিন।

প্রতিবাদকারীদের প্রদত্ত গীবতের সংজ্ঞা এবং শরীআত প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও তার পরিণতি

তরজুমানুল কুরআন জুন (১৯৫৯ খৃ.) সংখ্যায় আমি সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছিলাম তা আপনি পুনরায় পাঠ করুন। এক দৃষ্টিতেই আপনি জানতে পারবেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর আলোকে যে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষক্রটির চর্চা করাই গীবত। কিন্তু এর বিপরীত শরীআত প্রণেতা নন, এমন এক ব্যক্তি গীবতের যে সংজ্ঞা প্রদান করেন তার আলোকে এই নিকৃষ্ট কথা কেবল এই অবস্থায় গীবতের পর্যায়ে পড়বে যখন তা অপদস্থ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে করা হবে এবং গীবতকারীর আকাঙ্খা এই হবে যে, সে যার দোষ বর্ণনা করছে সে তা অবহিত না হোক। প্রকাশ্যতই উপরোক্ত সংজ্ঞা অপরাপর বিশেষজ্ঞ আলেম ও ইমামগণের সংজ্ঞার মত আইন প্রণেতার প্রদত্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নয়, বরং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যার ফলে গীবতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথমতঃ আইন প্রণেতার সংজ্ঞা মূলত কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি বর্ণনাকে হারাম করেছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন এমন ব্যক্তির উপরোক্ত সংজ্ঞা এই হারামকে শুধুমাত্র এমন দোষত্রুটি বর্ণনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয় যার মধ্যে অপমান, অপদস্থ ও খাটো করার উদ্দেশ্য এবং গোপনীয়তার আকাঙ্খা বিদ্যমান, এ ছাড়া আর সব দোষত্রুটি উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে সাধারণত বৈধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ শরীআত প্রণেতার সংজ্ঞা সমাজকে গীবতের এমন একটি মাপকাঠি প্রদান করে যার ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিবেশে এই নিকৃষ্ট দোষচর্চার প্রতিরোধ করতে পারে। কারণ 'দোষচর্চা' ও "অনুপস্থিতিতে' এই দু'টি অংশ যেখানেই একত্র হয় সেখানেই শ্রোতা সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এখানে গীবতের চর্চা হচ্ছে। কিন্তু যিনি আইন প্রণেতা নন তার উপরোক্ত সংজ্ঞা সমাজকে এরূপ একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। কারণ এক ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা অন্যদের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তার বিচারক কেবল স্বয়ং দোষচর্চাকারী হতে পারে অথবা স্বয়ং আল্লাহ, যাঁর ভয় কারো মনে থাকলে গীবত থেকে দূরে থাকবে, অন্যথায় নিজের সৎ উদ্দেশ্য ও গোপন আকাঙ্খা থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছামত যার–তার গীবত করে বেড়াবে। সমাজের কেউই তার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ শরীআত প্রণেতা অনুপস্থিতিতে দোষচর্চাকে মূলতই হারাম সাব্যস্ত করার পর তাকে নিম্নোক্ত অবস্থায় বৈধ করেছেন–যখন 'সত্যের' খাতিরে তার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ এমন কোন প্রয়োজন যা শরীআতের দৃষ্টিতে একটি সঠিক ও বিবেচনাযোগ্য প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু যিনি শরীআত প্রণেতা নন তার প্রস্তাবনা ও ধারণা এক ধরনের দোষচর্চাকে তো চূড়ান্তভাবে হারাম করে যা বৈধ হওয়ার কোন পথ নেই এবং অন্য ধরনের দোষচর্চাকে সাধারণতই হালাল করে দেয় যার সাথে 'প্রয়োজন' অথবা 'সৎ উদ্দেশ্যে'র কোন শর্ত সংযুক্ত নেই।

চতুর্থতঃ শরীআত প্রণেতার আরোপিত 'বৈধতার শর্তাবলী' পুনরায় সমাজকে এতটা উপযুক্ত বানায় যে, তার পারিপার্শ্বিকতায় যে দোষচর্চাই হবে তা যাচাই করে প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারে যে, তা বৈধ প্রকৃতির দোষচর্চা কি না। কারণ যথার্থ শরঈ উদ্দেশ্য অথবা প্রয়োজন তো এমন জিনিস যা যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। দোষচর্চাকারীকে প্রত্যেক ব্যক্তিই জিজ্ঞেস করতে

পারে যে, কারো অনুপস্থিতিতে তুমি তার দোষচর্চা করছো তার কি প্রয়োজন আছে অথবা এর দ্বারা কোন্ বৈধ ও যুক্তিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাচ্ছো? সে যদি এটাকে যথার্থ ও শরীআতের দৃষ্টিতে অনুমোদনযোগ্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে পারে অথবা তা আপনা আপনি শ্রোতার বুঝে এসে যায় তবে তা বরদাশত করা যেতে পারে। অন্যথায় যে কোন শ্রোতা তাকে বলে দিতে পারে যে, তোমাকে যদি তোমার অন্তরের উষ্মা প্রকাশ করতে হয় তবে নিজের বাড়িতে গিয়ে তা করো, গীবতের এই গুনাহের সাথে অযথা আমাদের জড়াচ্ছ কেন।

কিন্তু আইন প্রণেতা নয় এমন বক্তি একদিকে তো প্রয়োজনে গীবতের বৈধতার দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং অপরদিকে লোকদেরকে এমন প্রতিটি দোষচর্চার খোলা অনুমতি দিচ্ছে যে সম্পর্কে সে এই দাবি করে যে, খাটো করা বা অপমানিত করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং আমি গোপন রাখার আকাঙ্খাও পোষণ করি না। এরপর সমাজে আর কোন ব্যক্তি এই প্রশ্ন তুলতে পারে না যে, জনাব! কোন্ প্রয়োজনে এই কাজ করা হচ্ছে?

পঞ্চমতঃ শরীআত প্রণেতার আরোপকৃত বৈধতার শর্তাধীনে যে দোষক্রটিই বর্ণনা করা হবে তার উপর সেই সমস্ত সীমা ও শর্তাবলী আরোপিত হবে যা শরীআতে উপরোক্ত ধরনের হারাম কাজের প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে এবং যা একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ রাখা হয়েছে। অর্থাৎ

১. যে অবস্থায় এ ধরনের দোষক্রটি বর্ণনা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

২. যতটুকু দোষ বর্ণনা করা বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে কেবলমাত্র ততটুকুই বর্ণনা করা যাবে।

৩. প্রয়োজন দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে দোষক্রটি বর্ণনার বৈধতাও শেষ হয়ে যায় এবং ঐ কাজ পুনরায় হারাম হয়ে যায়। যেমন শূকরের গোশত মূলতই হারাম এবং জান বাঁচানোর আওতায় কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনে ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ এবং প্রয়োজনের ন্যূনতম সীমা পর্যন্তই তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা হতে পারে না যে, ক্ষুধা পেলেই লোকেরা শূকর খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে এবং উদর পূর্তি করে আহার করবে, আর অন্য সময়ের জন্য তা কাবাব করে রেখে দিবে। অথবা বলা যায়, মানবজীবন হত্যা মূলতই হারাম এবং প্রয়োজনের

পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ। হত্যা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন পূর্ণ সতর্কতা সহকারে তা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং কেবলমাত্র ততটুকুই হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায় যতটুকু বাস্তবিকপক্ষেই জরুরী। প্রয়োজন শেষ হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ঠিক এই শর্তাবলীই গীবতের ক্ষেত্রেও আরোপিত হবে, যেহেতু তা মূলতই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীআত প্রণেতা নয় সে তার প্রদত্ত সংজ্ঞায় যে জিনিস গীবতের অন্তর্ভুক্ত করেছে সে তা কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ করে না এবং যা সে এই সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখে তার উপর উপরোক্ত শর্তাবলীর কোনটিই আরোপিত হয় না।

শরীআত প্রণেতার সংজ্ঞা ও যে ব্যক্তি শরীআত প্রণেতা নয় তার সংজ্ঞার মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান, যা গীবতের প্রকৃতি ও তার বিধানের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। এখন যার ইচ্ছা শরীআত প্রণেতার কথা মানবে আর যার ইচ্ছা অন্যদের কথা অনুসরণ করবে। ইতিপূর্বে (জুন সংখ্যায়) আমি ইবনে হাজার (র) ও নববী (র)-এর যে বাক্য উদ্ধৃত করেছি তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এই মাসআলার ব্যাপারে উম্মাতের আলেমগণ সঠিক শরঈ মর্যাদা তাই বুঝেছেন যা আমি বর্ণনা করেছি। আর হাদীস বিশারদগণ রাবীগণের দোষগুণ যাচাই ও পর্যালোচনার (جرح وتعديل) যে কাজ করেছেন তা এই মনে করে করেননি যে, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গোপন রাখার আকাঙ্খা ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তির দোষক্রটি ঢাক বাজিয়ে প্রচার করে বেড়ানো তাদের জন্য মূলতই এবং সাধারণতই বৈধ, বরং তাঁরা এ কাজ আসলেই হারাম এবং একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদিত মনে করেই করেছেন। এজন্য তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। তাই তাঁরা শুধুমাত্র প্রয়োজন পরিমাণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের দোষক্রটি যাচাই করেছেন, যার প্রভাব হাদীসের যথার্থতার উপর প্রতিফলিত হতে পারে। এজন্য তাঁরা সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেছেন, এই সীমা তাঁরা সাধারণত লঙ্ঘন করেননি। আর যে কেউ তা অতিক্রম করলে অপরাপর মুহাদ্দিসগণ তার প্রতিবাদ করেছেন।

কোন ব্যক্তি হয়তো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে যে, অমুক অমুক কাজের যেহেতু হুকুম দেওয়া হয়েছে তাই এই হুকুম পালন করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের অনুপস্থিতিতে তাদের যে দোষক্রটি বর্ণনা করা হবে তা সরাসরি

হালাল এবং ভালো কাজ, বরং তা গীবতের সংজ্ঞা বহির্ভূত। আপনি সামান্য চিন্তা করেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, এটা সম্পূর্ণতই একটা বাতিল যুক্তি। শরীআতের কোন ইতিবাচক নির্দেশ তার কোন নেতিবাচক নির্দেশকে সরাসরি শেষ করে দিতে পারে না। ফরজ অথবা ওয়াজিব নির্দেশই হোক অথবা মুস্তাহাব বা ভালো কাজই হোক তা কেবল শরীআত অনুমোদিত পন্থায়ই সম্পাদন করতে হবে। অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ কাজ শুধু এই যুক্তিতে বৈধ করা যায় না যে, একটি ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য তা করা হচ্ছে। আর না শরীআতের কোন নেতিবাচক নির্দেশের এমন কোন সংশোধন করা যেতে পারে, যে নিষিদ্ধ কাজ কোন ইতিবাচক নির্দেশ সমাপনের জন্য করা হচ্ছে তা মূলতই নিষিদ্ধ কার্যাবলীর সীমা বহির্ভূত গণ্য হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরীআত আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছে এবং দরিদ্রদের খাদ্যদান খুবই পুণ্যের কাজ যা শরীআতেরও দাবি। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কি চুরি করা হালাল হয়ে যাবে? আর এই যুক্তি পেশ করা কি সঠিক হবে যে, এ কাজ মোটেও চুরি নয়, কারণ তা দরিদ্রদের অন্নদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে? নিঃসন্দেহে কোন কোন ইতিবাচক কাজের জন্য প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ নয়, বরং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ কোন কোন অবস্থায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু তার ভিত্তি এই নয় যে, ঐ নিষিদ্ধ কাজ অমুক ভালো কাজের জন্য করা হচ্ছে, বরং তা কেবল এমন অবস্থায়ই করা যেতে পারে যখন একটি ভালো কাজ সম্পাদন ঐ নিষিদ্ধ কাজের উপর নির্ভরশীল হয় এবং তার কল্যাণকারিতা সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ কাজের ধ্বংসকারিতার তুলনায় অধিক ব্যাপক এবং ঐ নিষিদ্ধ কাজে জড়িত না হলে উক্ত ভালো কাজের মহান কল্যাণকারিতা লুপ্ত হয়ে যায়।

বিশেষ কোন প্রয়োজনে ও যথার্থ উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। শরীআত প্রণেতা যেখানেই কারো অনুপস্থিতিতে তাকে ভর্ৎসনা করেছেন অথবা অন্যদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, সেখানেই এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরং উক্ত নীতিমালা শরীআত প্রণেতার এ ধরনেরই বক্তব্য ও কার্যাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যথায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা যেখানে গীবত হারাম করেছেন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, কারো অনুপস্থিতিতে তার প্রকৃত দোষক্রটির বর্ণনা, যা তার অছন্দনীয়, গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই হারাম কাজ কেবলমাত্র এ যুক্তিতে সাধারভণভাবে বৈধ হতে পারে না যে, আপনি শরীআত প্রণেতার অন্য কোন ইতিবাচক নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য গীবতে লিপ্ত

হচ্ছেন। ক্ষণিকের জন্য যদি তা মেনেও নেয়া হয় যে, বিশেষত হাদীসের রাবীগণেরই দোষক্রটি বর্ণনা করার কোন হুকুম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন, যেমন এক ব্যক্তি জিদ ধরেছেন, তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকও বুঝতে পারে যে, এই ধরনের নির্দেশ অবশ্যই গীবতের নির্দেশের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হবে। আর তার কারণ অবশ্যই এই হবে যে, কয়েকজন জীবিত ও মৃত ব্যক্তির দোষক্রটি বর্ণনার ক্ষতি শরীআত প্রণেতার দৃষ্টিতে দীনকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করার কল্যাণের তুলনায় কম ক্ষতিকর।

(তরজুমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫৯ খৃ.)।

গীবত প্রসংগে আলোচনার আরেকটি দিক

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য এক ব্যক্তি লিখেছেন ঃ

"আপনি তরজুমানুল কুরআনের জুন (১৯৫৯ খৃ.) সংখ্যায় গীবত প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে খতীব আল-বাগদাদীর "আল-কিফায়া ফী ইলমির রিওয়ায়া" (الكفاية فى علم الرواية) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে হাদীসের রাবীগণের কার্যকলাপ যাচাইকারী ইমামগণের (ائمة جرح تعديل) যে বক্তব্য নকল করেছেন সেই প্রসংগে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আপনার প্রতি অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করেছেন। তিনি খতীব বাগদাদীর উপরোক্ত গ্রন্থের বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করে বলেন যে, খতীবের দৃষ্টিভঙ্গী আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং আপনি তাঁর সমস্ত আলোচনা বর্জন করে কেবলমাত্র সেখানে আপনার মতের অনুকূল কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। এই প্রসংগে আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন"।

লেখকের জবাব

আপনি আমার যে প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন তা পুনরায় পাঠ করে দেখে নিন, তাতে আমি কোথাও খতীব বাগদাদীর অভিমত প্রমাণ হিসাবে পেশ করিনি, আর না তাঁকে আমার মতের সাথে একাত্মতাকারী হিসাবে পেশ করেছি। আমি একটি বিষয়ের বিধান যেখানে পরিষ্কারভাবে হাদীস থেকে পেয়ে যাচ্ছি সেখানে খতীব বাগদাদী বা তাঁর চেয়েও বড় কোন আলেমের অভিমতের শেষ পর্যন্ত কি মূল্য দিতে পারি। আমি কেবল একজন নকলকারী হিসাবে হাদীস যাচাইকারী কতক

ইমামের বক্তব্য তাঁর কিতাব থেকে নকল করেছি। আমি যদি তাঁর অভিমত প্রমাণ হিসাবে পেশ করতাম তবে অবশ্য অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করা যেত।

কিন্তু যে বুযুর্গ অন্যদের উপর অবিশ্বস্ততার অপবাদ আরোপ করেন তাঁর নিজের মাত্র দু'টি বিশ্বস্ততার নমুনা লক্ষ্য করুন। এই দু'টি নমুনাই আপনার উল্লেখিত প্রবন্ধে বিদ্যমান আছে। তিনি আল্লামা ইবনে হাজার (র) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি এর (গীবতের) আরও একটি দিক উন্মুক্ত করেছেন। তা এই যে,

وَهُوَ اَنْ يَّذْكُرَهُ فِىْ غَيْبَتِهِ بِمَا فِيْهِ يَسُؤُهُ قَاصِدًا بِذَالِكَ الْاَفْسَادِ .

"এই দোষত্রুটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হবে মূলত বিপর্যয় সৃষ্টি করা। অন্য কথায় তা এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, হাফেজ ইবনে হাজার (র) আলোচিত দোষত্রুটি গীবত হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য এটা জরুরী মনে করেন যে, বিপর্যয় সৃষ্টিই হবে তার উদ্দেশ্য।"

এখন আপনি ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, ৩৬১ নং পৃষ্ঠা কিছুটা দেখে নিন। সেখানে আল্লামা ইবনে হাজারের মূল বাক্য এভাবে রয়েছে ঃ

اَلْغِيْبَةُ قَدْ تُوْجَدُ فِىْ بَعْضِ صُوَرِ النَّمِيْمَةِ وَهُوَ اَنْ يَّذْكُرَهُ فِىْ غَيْبَةِ بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَسُؤُهُ قَاصِدًا بِذَالِكَ الْاَفْسَادِ .

"চোগলখোরীর কোন কোন অবস্থার মধ্যেও গীবত পাওয়া যায়। তা এই যে, কোন ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির প্রকৃত দোষত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।"

উপরোক্ত বাক্যে আল্লামা ইবনে হাজার (র) গীবতের নয়, বরং চোগলখোরীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং এই কথা বলতে চাচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে শুধু তার দোষত্রুটি সহকারে তার উল্লেখ করা হয় তবে তা চোগলখোরীর আওতায় পড়বে।

বিশ্বস্ততার এর চেয়েও আশ্চর্যজনক নমুনা যা তিনি মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামীর ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, মায়েয-এর ঘটনা সহীহ মুসলিমের যে অনুচ্ছেদে (باب من اعترف على نفسه بالزنا) উল্লেখিত হয়েছে সেখানকার সমস্ত হাদীস তিনি অধ্যয়ন করেছেন। আর এসব হাদীস পাঠে

তিনি যা অনুধাবন করতে পেরেছেন তা এই যে, "পাথর নিক্ষেপে হত্যার (رجم) ঘটনার বহু পূর্ব থেকেই সে কুখ্যাত ছিল এবং তার কোন কোন চরম নৈতিক দুর্বলতার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সটকে পড়েছিল। কিন্তু ইসলামে যেনার শাস্তি যেহেতু খুবই কঠোর, তাই সে যতক্ষণ পরিষ্কারভাবে আইনের আওতায় আসেনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।"

এখন সহীহ মুসলিমের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি বের করে কিছুটা দেখে নিন। এই অনুচ্ছেদের অধীনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, মায়েয যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে চারবার যেনার কথা স্বীকার করেন তখন তিনি তার গোত্রের লোকদের জিজ্ঞেস করেন যে, সে কেমন লোক? তারা বলেন ঃ

مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا اِلاَّ اَنَّهُ اَصَابَ شَيْئًا يَرٰى اَنَّهُ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْهُ اِلاَّ اَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ .

"আমাদের জানামতে তার মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে সে এমন একটি কাজ করে বসেছে যে সম্পর্কে তার ধারণা হলো যে, তার পরিণাম থেকে সে মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ তার উপর দণ্ড (হদ্দ) কার্যকর না হবে।"

এ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মায়েয সম্পর্কে তার গোত্রের লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করেন তখন তারা জওয়াব দেন ঃ

مَا نَعْلَمُهُ اِلاَّ وَفِى الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِنَا فِيْنَا نَرٰى .

"আমরা এতটুকুই জানি যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী এবং আমাদের জানামতে সে ভালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি পুনর্বার তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন ঃ

لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ بِعَقْلِهِ .

"তার মধ্যে কোন খারাবী নেই এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির মধ্যেও নয়"।

প্রশ্ন হচ্ছে– শেষ পর্যন্ত সহীহ মুসলিমের কোন হাদীসের ভিত্তিতে বুযুর্গ সাহেব জানতে পারলেন যে, মায়েয ইবনে মালেক আগে থেকেই সমাজে কুখ্যাত হিসাবে পরিচিত ছিলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ পতিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শুধু আইনের আওতায় এসে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন?

এই কল্পনা-প্রাসাদের ভিত্তি যার উপর স্থাপন করা হয়েছে তা এই যে, "শাস্তি কার্যকর করার পরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ভাষণ দেন যাতে তিনি তার খারাপ কাজের প্রতি নিম্নোক্ত বাক্যে ইংগিত করেন ঃ

اَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِىْ عِيَالِنَا لَهٗ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ............

(আমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধে গমন করি তখন কোন না কোন ব্যক্তি পেছনে আমাদের পরিজনদের মাঝে থেকে যায় এবং ছাগলের শব্দের ন্যায় আওয়াজ করে....)।

কমবেশি এই বিষয়বস্তু সম্বলিত চারটি হাদীস ইমাম মুসলিম (র) নকল করেছেন যা থেকে অনুমিত হয় যে, মায়েযের চরিত্র সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানে কি কথা বিদ্যমান ছিল।

প্রথমত, কোন মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরপরই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ও মেজাজের পরিপন্থী। এজন্য সীরাতে পাক (মহানবীর জীবন চরিত) সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষণের এমন অর্থ করতে পারে না– যে অর্থ ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন। অনন্তর এই প্রসংগে হাদীসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয় যে, এখানে মায়েযকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য কি না। সহীহ মুসলিমের যে চারটি রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা পড়ে দেখা যেতে পারে। তার মধ্যে কোন হাদীসেই এরূপ ইংগিত নাই যে, প্রতিটি জিহাদের সময় মায়েয ইবনে মালেক পিছনে থেকে যেতো এবং মুজাহিদদের মহিলাদের খারাপ করার অসৎ উদ্দেশ্যে ঘুরাফেরা করতে থাকতো। বরং তা থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, যেনার অপরাধের প্রথম

বারের মত শাস্তি কার্যকর করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষণে মদীনার সেইসব লোককে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন, যারা মুজাহিদদের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাওয়ার পর তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরাফেরা করতো। তিনি এই মনস্তাত্বিক ক্ষেত্রে, যখন সমগ্র মদীনা পাথর নিক্ষেপে হত্যার এই ভয়ংকর শাস্তি অবলোকন করে কেঁপে উঠেছিল, তাদের নোটিশ দিলেন যে, বর্তমানে এখানে কঠিন ফৌজদারী আইন জারী করা হলো। ভবিষ্যতে যে কেউ এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হবে তাকেই মায়েযের অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে। শুধু এতটুকুই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম تَخَلَّفَ رَجُلٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা থেকে এই অর্থ বের করা ঠিক হবে না যে, এই رَجُلٌ (ব্যক্তি) বলতে মায়েযকে বুঝানো হয়েছে। অপর বর্ণনায় اَحَدُهُمْ অথবা اَحَدُكُمْ (তাদের মধ্যে বা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি) শব্দ এসেছে। আর মায়েয সম্পর্কে গোটা হাদীস ভাণ্ডারে ও রিজাল শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই যে, তিনি এ ধরনের লম্পট লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে তার সম্পর্কে তো তার নিজ গোত্রের লোকদের এই শক্তিশালী সাক্ষ্য বিদ্যমান ছিল যে, তিনি একজন সত্যনিষ্ঠ লোক এবং কোন এক সময় তার দ্বারা একটি গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি যদি লম্পট চরিত্রের লোক হতেন এবং মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাদের মহিলাদের সম্ভ্রম হরণকারী হতেন তবে তাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করার এবং তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতো না।

সামনে অগ্রসর হয়ে বুযুর্গ সাহেব বলেন, "মায়েযের উপর শাস্তির দণ্ড কার্যকর হওয়ার পর সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদলের রায় ছিল যে, তার গুনাহ তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের মতে মায়েযের অপরাধের স্বীকারোক্তি ও তার তওবার কোন গুরুত্বই ছিল না। তারা এগুলোকে এখন অতীত কাহিনীর মূল্যহীন কথা মনে করতেন এবং মায়েযের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ ছিল তার উপর তারা পূর্ববৎ স্থির থাকেন।"

উপরোক্ত কথার ভিত্তি হাদীসের যে বাক্যের উপর রাখা হয়েছে তা বুযুর্গ সাহেব নিজেই উদ্ধৃত করেছেন ঃ

قَائِلٌ يَقُوْلُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ اَحَطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ .

এর সঠিক তরজমা এই যে, "কেউ বলেছিল, এই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তার গুনাহ্ তাকে নিজের পরিধির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে।" কিন্তু বুযুর্গ সাহেব এর তরজমা করেছেন ঃ "একদল লোক বলতো, এই ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তার গুনাহসমূহ তাকে নিজের ঘূর্ণাবর্তে নিয়ে নিয়েছে।" খাতীআ (গুনাহ) শব্দের তরজমা 'গুনাহ' করা হলে এই অলীক মতবাদ হাওয়ায় বিলীন হয়ে যেত যে, মায়েয প্রথম থেকেই চরম দুষ্কৃতিকারী ছিল এবং সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিসম ছিলেন। এজন্য খাতাইয়া (ব. ব.) কল্পনা করে "গুনাহসমূহ" তরজমা করা হয়েছে, যাতে যেনার অপবাদসহ এ ধরনের আরও অনেক অপরাধ এই সাহাবীর কাঁধে নিক্ষেপ করা যায়, যার গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার এবং জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেছেন এবং এই পৃথিবী থেকে যিনি আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর পূর্বে বিদায় নিয়েছেন।

এরপর যেসব লোক মায়েয (রা) সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিল যে, "ঐ ব্যক্তিকে দেখ! আল্লাহ তাআলা তাকে পর্দাবৃত করে রেখেছিলেন, কিন্তু তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই কুকুরকে মৃত্যুর দুয়ারে না পৌঁছানো হয়েছে।" তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "তাদের মন্তব্যেও কোন সহানুভূতি বা আক্ষেপের লেশমাত্র ছিল না। বরং এসব লোক– যেমন পূর্বে বলে এসেছিল– মায়েযের পূর্বেকার কুখ্যাতির ভিত্তিতে তার সম্পর্কে খুবই কঠোর মনোভাব পোষণ করতো এবং তার অপরাধের স্বীকারোক্তির ব্যাপারটিকে কোন গুরুত্বই দিত না। এ কারণে আলোচিত মন্তব্যে শুধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করার আবেগই বর্তমান ছিল না, বরং অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির ঘৃণা ও অসন্তোষের আবেগও বিদ্যমান ছিল।"

উপরোক্ত মন্তব্যের বাক্যসমূহ আপনার সামনেই বর্তমান আছে। তা থেকে কি প্রকাশ পায় যে, তারা মায়েযের কুখ্যাতির কারণে তার সম্পর্কে নেহায়েত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন, তার প্রতি চরম ঘৃণা ও অসন্তোষ পোষণ করতেন এবং মনে করতেন যে, এরকম খারাপ প্রকৃতির লোকের অনুরূপ পরিণতিই হওয়া উচিত? যদি তাদের প্রতিক্রিয়া তাই হতো তবে তাদের এ কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল যে, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাত তাঁর পর্দার মধ্যে ঢেকে নিয়েছিলেন, কিন্তু সে তা মানলো না? উক্ত বাক্যসমূহের অর্থ শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা চাচ্ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন তার অপরাধ গোপন রেখেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও বর্তমান ছিল না তখন এই অপরাধের কথা তার

গোপন রাখাই উচিত ছিল এবং অযথা অপরাধ স্বীকার করে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এই ব্যক্তির শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার যে আন্তরিক আকাঙ্খা তাদের বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে তা কি এজন্য যে, তারা মায়েযের অতীত অপরাধের কারণে তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিশ্চিত ছিলেন যে, এই ব্যক্তি মন্দ কাজের উচিৎ শাস্তি লাভ করেছে?

আমি এই ইতিহাসের উপর কোন পর্যালোচনা করতে চাই না। আপনি স্বয়ং দেখতে পারেন যে, শুধুমাত্র নিজের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে একটি মনগড়া কাহিনী দাঁড় করানো হয়েছে এবং সহীহ মুসলিমের হাদীস হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে একজন সাহাবীর উপর নিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করার ব্যাপারে মোটেই দ্বিধা করা হয়নি। এরপর তো ঐ বুযুর্গ সাহেবের আরোপিত প্রতিটি অপবাদই মুখ বুজে সহ্য করা উচিত।

(তরজুমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৫৯ খৃ.)

তৃতীয় ভাগ

গীবত ও তার অনিষ্টকারিতা

–ইমাম গাযালী (র)

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে গীবতকে একটি দোষ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং গীবতকারীকে মৃতভুক প্রাণীর সমতুল্য গণ্য করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ .

"তোমরা পরস্পরের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হারাম"।

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

"তোমরা পরস্পরকে হিংসা করো না এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। তোমাদের কতক যেন অপর কতকের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) না করে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে যাও"।

اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةِ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا .

“তোমরা গীবত সম্পর্কে সাবধান হও। কারণ গীবত যেনার চাইতেও মারাত্মক”।

তার কারণ এই যে, কোন ব্যক্তি যেনা করার পর আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করতে পারেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত গীবতকারীর গুনাহ মাফ হয় না। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “মিরাজের রাতে আমি এমন একদল লোককে অতিক্রম করলাম যারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এসব লোক গীবত করতো এবং মানুষের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে টানাটানি করতো”।

হযরত সুলায়মান ইবনে জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমাকে উত্তম কিছু বলে দিন যা দ্বারা আমার উপকার হতে পারে। তিনি বলেন ঃ কোন উত্তম বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করো না, তা তোমার বালতি থেকে পিপাসার্তের পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার কাজই হোক না কেন।... আরো এই যে, তোমার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করো না।

বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত উচ্চস্বরে খোতবা (ভাষণ) দেন যে, বাড়িতে অবস্থানরত মহিলারাও তা শুনতে পায়। ভাষণে তিনি বলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَتَهُمْ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ اَخِيْهِ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِىْ جَوْفِ بَيْتِهِ .

“হে উপস্থিত জনতা! যারা বাচনিক ঈমান এনেছে কিন্তু আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গীবত করতে উদ্যত হয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করতে উদ্যত হয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন এবং আল্লাহ যাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন তাকে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেই বেইজ্জত করেন”।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর উপর ওহী নাযিল করেন যে, কোন ব্যক্তি গীবতের গুনাহ্ থেকে তওবা করে মারা গেলে সে সবশেষে বেহেশতে যাবে এবং তওবা না করে মারা গেলে সবার আগে দোযখে যাবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন ইফতার না করে। লোকজন রোযা রাখলো। সন্ধ্যা হলে তারা একে একে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে থাকে এবং ইফতার করার অনুমতি চাইতে থাকে, তিনিও অনুমতি দিতে থাকেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইটি স্ত্রীলোকও রোযা রেখেছে, অনুমতি হলে তারাও ইফতার করবে। তিনি নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ তারা রোযা রাখেনি। যারা দিনভর মানুষের গোশত খায়, তাদের রোযা হয় কিভাবে! তুমি গিয়ে তাদের বলো, তোমরা রোযা থেকে থাকলে বমি করো।

লোকটি তাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম শুনালে তারা বমি করলো এবং তাদের মুখ থেকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড বের হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাকে ঘটনা অবহিত করে। তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এই রক্তপিণ্ড তাদের পেটের মধ্যে থেকে গেলে দোযখ তাদের গ্রাস করতো। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি পুনরায় এসে বললো, তারা দুইজন মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন ঃ তাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসো। তারা উপস্থিত হলে তিনি একটি বড় পাত্র আনিয়ে তাদের একজনকে পাত্রের মধ্যে বমি করতে বলেন। সে রক্তপুঁজ বমি করলো এবং তাতে পাত্র ভরে গেলো। তিনি অপর নারীকেও বমি করতে বলেন। সেও একইরূপ বমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে জিনিস হালাল করেছেন, এরা তা পানাহার করে রোযা রেখেছিল। কিন্তু তিনি যে জিনিস হারাম করেছেন তা দিয়ে তারা ইফতার করেছে। এরা দু'জন একত্রে বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে)।

আনাস (রা) আরও বলেন, উক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি এক দিরহাম (সেই যুগে পঁচিশ পয়সার সম-পরিমাণ) সূদ গ্রহণ করলে তার গুনাহ ছত্রিশবার যেনা করার চেয়েও মারাত্মক এবং মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ এর চেয়েও মারাত্মক গুনাহর কাজ।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি দুইটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কবরের বাসিন্দাদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা দু'জন খুব মারাত্মক কোন গুনাহ্ করেনি, অথচ তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদের একজন মানুষের গীবত করতো এবং অপরজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হতো না। অতঃপর তিনি গাছের দুইটি তাজা ডাল চেয়ে নিয়ে তা দুই ভাগ করে দুইজনের কবরের পাশে গেড়ে দেন এবং বলেন ঃ ডাল দু'টি যতক্ষণ তরতাজা থাকবে ততক্ষণ তাদের হাল্কা শাস্তি হবে (ইবনে আবিদ দুনয়া)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয আসলামীকে যেনার অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করান। এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, তাকে কুকুরের মত এই জায়গায় হত্যা করা হয়েছে। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জীবের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে বলেন ঃ এই মড়কটি খাও। তারা বললো, আমরা কি মড়ক খাবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা মায়েয সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছ তা এই মড়কের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।

মোটকথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পরের সাথে খোলামনে হাসিমুখে সাক্ষাত করতেন, কারো গীবত করতেন না, গীবত না করাকে উত্তম কাজ মনে করতেন এবং গীবতকারীকে মোনাফেক চরিত্রের লোক হিসাবে বিবেচনা করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের মুসলমান ভাইয়ের গোশত খায়, আখেরাতেও তার সামনে সেই গোশত দেয়া হবে এবং আদেশ করা হবে, জীবদ্দশায় তুমি যেভাবে খেয়েছিলে, আজও এটা খাও। সে নিরুপায় হয়ে মুখ বাঁকা করে তা খেতে বাধ্য হবে আর চিৎকার করতে থাকবে। অনুরূপ বিষয় সম্বলিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও বিদ্যমান আছে।

একদা দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজায় বসা ছিল। এক নপুংসক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তারা তার সমালোচনা করে। ইতিমধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হলো। লোক দু'টি জামাআতে নামায পড়ার পর তাদের মনে চিন্তার উদয় হলো যে, তারা লোকটির অযথা সমালোচনা করেছে। তাদের নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ হলো। তারা আতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে জানালো। তিনি বলেন, তোমরা পুনরায় উযু করে নামায পড়ো। তোমরা রোযাদার হয়ে থাকলে পুনরায় রোযা রাখো।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকদের "নিন্দা করে" (সূরা হুমাযা ঃ ১), এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, "হুমাযা" দ্বারা সেইসব লোক বুঝায় যারা মানুষকে তিরস্কার করে, তাদের অপমান করে এবং "লুমাযা" বলা হয় গীবতকারীকে।

কাতাদা (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, কবরের আযাবের তিনটি অংশ আছে ঃ এক-তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরির কারণে এবং এক-তৃতীয়াংশ পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! মুসলমানদের ধর্মে গীবতের কুপ্রভাব মানবদেহে اَكِلَةٌ (মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজোকারী এক প্রকার ব্যাধি) রোগের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। অর্থাৎ اَكِلَةٌ রোগ মানবদেহকে যেভাবে ভক্ষণ করে নিঃশেষ করে দেয়, তদ্রূপ গীবত দীনকে চেটে খেয়ে ফেলে। আগের কালের আলেমগণ গীবত ত্যাগ করাকে ইবাদত গণ্য করতেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কখনো তোমার লোকজনের দোষত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা হলে তোমার নিজের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করো। ইমাম হুসাইন (রা) বলতেন, হে আদম সন্তান! ঈমানের উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে চাইলে তোমার মধ্যে যে দোষ আছে, অনুরূপ দোষের কারণে অপরকে খারাপ বলো না। প্রথমে নিজের দোষ সংশোধন করো এবং নিজের দোষত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত হলে অপরের কুৎসা করার সময় পাবে না। এরূপ ধরনের লোক আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়।

মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন, একদা হযরত ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীগণসহ (সাহাবীগণ) একটি মরা কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাওয়ারীগণ বললেন, কি মারাত্মক দুর্গন্ধ আসছে! তিনি বলেন, কুকুরটির দাঁতগুলো কত ধবধবে সাদা। এ কথা বলে তিনি কুকুরের গীবত না করতেও পরোক্ষে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির সদগুণ ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করা উচিত নয়।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির গীবত করতে শুনলেন। তিনি বললেন, খবরদার! গীবত করো না। মানবজাতির মধ্যে যারা কুকুরতুল্য, গীবত হলো তাদের সালন। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলার

যিকির করো তাতে তোমার রোগ দূরীভূত হবে। মানুষের দোষচর্চায় রোগ বৃদ্ধি পায়।

শুধু মুখের কথায়ই গীবত হয় না, দৈহিক ত্রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের ত্রুটি বর্ণনা করায়ও গীবত হয়। ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তির উল্লেখ করার সাথে বলে ফেলেন যে, সে বোবাও। তিনি এটাকেও গীবত মনে করে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন, কারো গীবত করো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক নারী সম্পর্কে বললাম যে, তার কাপড়ের আচল খুব লম্বা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি থুথু ফেলো। আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে এক টুকরা গোশত বেরিয়ে আসে।

কোন ব্যক্তি অভিনয়ের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির দোষত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে যেন লোকেরা বাস্তবে তার দোষ দেখতে পাচ্ছে এরূপ মনে হয়। কলম হলো বাকশক্তির অর্ধেক। অতএব কেউ যদি লেখনীর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দোষ বা কথা লিপিবদ্ধ করে তবে তাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। তবে "কতক লোক এইরূপ বলে" এভাবে লেখা যেতে পারে। এটা গীবত নয়। কোন লোকের কোন কাজ বা আচরণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোপুত না হলে তিনি বলতেন ঃ লোকজনের কী হলো যে, তারা এরূপ করে। তিনি কখনো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতেন না।

গীবত (পরনিন্দা) শুনে আনন্দিত হওয়াও গীবতের মধ্যে গণ্য। কারণ আনন্দ প্রকাশ করলে গীবতকারী খুশি হয় এবং আরো অধিক গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কারো গীবত করলো। শ্রোতা বললো, ভাই! আমি তাকে এরূপ মনে করতাম না। আজ পর্যন্ত আমি তাকে অন্যরূপ ভাবতাম। তুমি তার আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করলে। আল্লাহ বাঁচালেন। এতে গীবতকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আরো দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং শ্রোতা সাথে সাথে সায় দিতে থাকে। মোটকথা, কারো গীবত শোনা এবং তা বিশ্বাস করাও গীবতের পর্যায়ে গণ্য, বরং যে নীরবে গীবত শুনতে থাকে সেও গীবতে অংশগ্রহণ করে। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

اَلْمُسْتَمِعُ اَحَدُ الْمُغْتَابِيْنَ .

"গীবত শ্রবণকারীও গীবতকারীদের একজন" (তারাবানী)।

একদা হযরত আবু বাকর (রা) ও হযতর উমার (রা)-র মধ্যকার একজন অপরজনকে বললেন, অমুক লোক খুবই অলস, অতঃপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রুটি খাওয়ার জন্য সালন চাইলেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তো সালন নিয়েছ! তাঁরা বললেন, আমাদের তো মনে নেই কবে সালন নিয়েছি! তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের মুসলমান ভাইয়ের গোশত খেয়েছো। পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, কথাটি একজনে বলেছেন কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি মায়েয আসলামীর বদনাম করেছিল, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

অতএব কেউ কারো গীবত করলে তাকে বাধা দিতে হবে, বাধা দেয়া সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। সম্ভব হলে গীবতের মজলিস ত্যাগ করতে হবে অথবা গীবতকারীকে ভিন্ন প্রসঙ্গে মশগুল করার চেষ্টা করতে হবে। এরূপ কোন চেষ্টা না করলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। আর কারো মধ্যে গীবত শোনার আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলে তা মোনাফেকী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আন্তরিকভাবে গীবতকে খারাপ জানলে এবং যথাসাধ্য তাতে বাধা দিলেই কেবল গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ اُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَذَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ .

“কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হলো এবং উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করলো না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত করবেন” (আহ্মাদ, তাবারানী)।

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّذُبَّ عَنْ عِرْضِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

“যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করলো, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করবেন” (ইবনে আবিদ দুন্য়া)।

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ .

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষার সহায়তা করলো, তাকে দোযখ থেকে নিস্কৃতি দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কর্তব্য হয়ে যায়" (আহ্মাদ, তাবারানী)

গীবত করার কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫) অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

(১) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(২) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে

জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(৩) আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ্‌ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

মনে মনে গীবত করাও হারাম

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ্‌ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ .

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন

সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

গীবত থেকে বাঁচার উপায় ঃ দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী কর্মই হলো খারাপ স্বভাব থেকে নিরাময় লাভের মহৌষধি। কারো গীবত করার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করতে হবে, যাতে গীবতের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আরও স্মরণ করতে হবে যে, যার গীবত করা হবে তার পাপ গীবতকারীর আমলনামায় সরিয়ে দেয়া হবে এবং গীবতকারীর পুণ্য তার আমলনামায় যোগ করা হবে। এভাবে গীবতের কারণে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং পুণ্যের পরিমাণ কমে যাবে, পরিণতিতে দোযখের বাসিন্দা হতে হবে।

গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন কারো দোষচর্চার ইচ্ছা হবে, তখনই নিজের মধ্যকার দোষসমূহ স্মরণ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে ঃ যে দোষ আমার মধ্যে আছে সেই দোষের জন্য আমি অপরের বদনাম কীভাবে করতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ .

"সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষ-ত্রুটি অপরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে" (বায্যায)।

দোষগুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় আহাম্মক আর কেউ নয়।

গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন গীবত করার ইচ্ছা জাগবে তখন মনে মনে চিন্তা করবে যে, কেউ যদি আমার গীবত করে তবে আমি দুঃখ পাবো, মানুষের সামনে লজ্জিত হবো, অপমানিত হবো, আমার সম্পর্কে মানুষের সুধারণা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হবে। তদ্রূপ আমি যদি কারো গীবত করি তাহলে তার অবস্থাও তো ঐরকম হবে। অতএব আমার বিরুদ্ধে যা করা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই, সেই ধরনের কাজ অপরের বিরুদ্ধে আমার করা উচিত নয়।

ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়েই মানুষ সাধারণত গীবতে লিপ্ত হয়। ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। খুব কম লোকই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ দোযখে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اِنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اِلاَّ مَنْ شَفٰى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

“দোযখের একটি বিশেষ দরজা আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানি করে সে ঐ দরজা দিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে”।

সহকর্মীদের বা বন্ধুদের দেখাদেখি অনেক সময় মানুষ অপরের গীবতে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সঙ্গদোষে মানুষ একটি মারাত্মক পাপ কাজ করে নিজের আমলনামাকে পাপে পূর্ণ করে। পাপ থেকে এবং দোযখ থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় অসৎ সংগ ত্যাগ করতে হবে। পরচর্চার সূত্রপাত হওয়ার আরও যেসব কারণ রয়েছে সেসব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তা ত্যাগ করতে হবে।

চোগলখোরি

—মুহাম্মদ মূসা

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস, একটি পাপাচার। কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে চোগলখোরির সমালোচনা করা হয়েছে।

চোগলখোরিও গীবতের একটি শ্রেণী। যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে। এটাও গীবতের ন্যায় কবীরা গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। এসব গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে।

"ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরি বলে" (ইমাম নববীর রিয়াদুস সালেহীন)। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ .

"যে লোক গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরি করে বেড়ায়" (সূরা কালাম ঃ ১৬)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ .

"চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম)।

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يَعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ بَلٰى اِنَّهَا كَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ .

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন ঃ এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন মারাত্মক গুনাহের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করছে না, হাঁ বিষয় দু'টি মারাত্মকই। তাদের একজন চোগলখোরি করতো এবং অপরজন আড়ালে-আবডালে পেশাব করতো না" (বুখারী, মুসলিম)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِىَ النَّمِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ .

"আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না "আদ্হ" কী? তা চোগলখোরি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছড়ানো" (মুসলিম)।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

"চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمُ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ وَالْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ .

"আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক" (মুসনাদে আহমাদ)।

اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَى اللّٰهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاِخْوَانِ الْمُلْتَمِسُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَشَرَاتِ .

"তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়" (তাবারানীর মুজামুল ওয়াসীত ও মুজামুস সাগীর)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো যে, চোগলিপনা একটি গুনাহের কাজ, চোগলখোরির কারণে কবরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং চোগলখোর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বেহেশত সৃষ্টি করার পর তাকে বলেন, কিছু বলো। বেহেশত বললো, যারা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে তারা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাআলা বলেন, আট শ্রেণীর লোক তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। চোগলখোর তাদের অন্তর্ভুক্ত (ইহ্য়া উলূমিদ দীন)।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাঈল জাতি একবার অনাবৃষ্টির শিকার হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন ঃ তোমার ও তোমার সংগীদের দোয়া এজন্য কবুল হচ্ছে না যে, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াচ্ছে। মূসা (আ) বলেন, হে আল্লাহ! তাকে শনাক্ত করে দিন। তাহলে আমরা তাকে আমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করবো। মহান আল্লাহ বলেন, হে মূসা! আমিই চোগলখোরি করতে নিষেধ করি, এখন আমিই আবার চোগলখোরি করবো! অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সকল সঙ্গীকে নিয়ে আল্লাহ্র কাছে তওবা করলে বৃষ্টি বর্ষিত হয় (ইহ্য়া উলূমিদ দীন)।

এ সম্পর্কে হাসান বসরী (র) একটি বাস্তব কথা বলেছেন ঃ

مَنْ نَمَّ اِلَيْكَ نَمَّ مِنْكَ .

“যে তোমার নিকট চোগলী কথা বলবে সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলী করবে” (ইহয়া উলূম)।

অতএব চোগলখোরি ও চোগলখোর সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চোগলখোরি একটি কবীরা গুনাহ। তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

“আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়” (সূরা নিসা ঃ ১০৬)।

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

“কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর যুলুম করলো, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে” (সূরা নিসা ঃ ১১০)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

وَانِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র নিকট দৈনিক এক শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তওবা করি" (মুসলিম)।

وَاللّٰهِ انِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

"আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই প্রতি দিন আল্লাহ্‌র নিকট সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি" (বুখারী)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে), আল্লাহ তাকে প্রতিটি কষ্টকর অবস্থা ও প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযিক দান করবেন" (আবু দাঊদ)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাক্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করেন, এমনকি তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মত মারাত্মক গুনাহ হলেও ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ .

"আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি"।

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি" (আবু দাঊদ, তিরমিযী)।